তিন মিতিন

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ   ১১ই কার্তিক ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
১নং ছিদামমুদি লেন,
কলিকাতা—৬

এতে আছে

বিষ

বয়স নেহাত কম নয় মহিলার। অন্তত বছর পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। মুখেও ভাঙচুর এসেছে টুকটাক। তবু সাজগোজের কী বহর! চোখে গাঢ় আই-লাইনার, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক, গালে থুতনিতে ব্লাশ-অনের উৎকট ছোপ। কাঁধ ছোঁওয়া স্টেপ-কাট চুলে সরু সরু সোনালি টান। দামি শিফন শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজটিও বিপজ্জনক রকমের সংক্ষিপ্ত। বোঝাই যায় খুকি সাজার চেষ্টায় মহিলার কোনও খামতি নেই।

মিতিন এক দৃষ্টে লক্ষ করছিল মহিলাকে। শুধু মেক-আপই নয়, মহিলার ভাবভঙ্গিও। একটু যেন কেমন কেমন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই হাজির হয়েছে ভর সন্ধেবেলা। বলল কী যেন জরুরি দরকার, অথচ টানা পাঁচ মিনিট বসে আছে সোফায়, মুখে বাক্যিটি নেই। ঘাড় ঝুলিয়ে রং করা বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে এক মনে।

নার্ভাস বোধ করছে কি? নাকি সংকোচ? পোশাকের জেল্লাই বলে দিচ্ছে, মহিলা যথেষ্ট পয়সাওয়ালা ঘরের। এই ধরনের মহিলারা যে যে কারণে পেশাদার গোয়েন্দাদের দ্বারস্থ হয়, তা মোটামুটি জানে মিতিন। হয় বর বুড়ো বয়সে কারও সঙ্গে লটঘট চালাচ্ছে, তার পিছনে ফেউ লাগাতে চায়। নয়তো নিজেই কোনও কেচ্ছা বাধিয়ে ফেঁসে গেছে, ব্ল্যাকমেলারের পাল্লায় পড়ে হাঁসফাঁস দশা, উদ্ধার পেতে শরণাপন্ন হয়েছে মিতিনদের। এর কেসটা কী? এক নম্বর? না দু'নম্বর?

মিতিন অবশ্য খোঁচাখুঁচিতে গেল না। মহিলার আড় ভাঙানোর জন্য নরম গলায় বলল, চা চলবে নাকি একটু?

মহিলা মুখ তুলেছে। চোখ পিটপিট করে বলল, যদি হয়...লিকার টি।

—উইথ সুগার?

—হ্যাঁ। এক চামচ।

উঠে আরতিকে নির্দেশ দিয়ে সোফায় ফিরল মিতিন। বসতে বসতে বলল, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি ম্যাডাম।

—বলিনি, না? মহিলা ফ্যালফ্যাল তাকাল, আমি লাবণ্য। লাবণ্য মজুমদার।

মহিলার দৃষ্টি যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। কেমন ঘোলাটে ঘোলাটে। উদ্‌ভ্রান্ত। মিতিন ফের জিজ্ঞেস করল, কাছাকাছি কোথাও থাকেন কি?

—খুব দূরে নয়। গড়িয়াহাটে।

—গড়িয়াহাটের কোথায়?

—এমারেল্ড টাওয়ার। গরচায় ঢুকেই যে দশতলা বিল্ডিংটা...

—যে বাড়িতে বিখ্যাত গায়ক অরুণ চক্রবর্তী থাকেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। উনি ফিফ্‌থ ফ্লোরে। আমরা আটতলায়।

—আমরা মানে?

—আমি, আর আমার হাজব্যান্ড।

—আপনাদের ছেলেমেয়ে?

—একটি মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। এমারেল্ড টাওয়ারের সেকেন্ড ফ্লোরে আমাদের আর একটি ফ্ল্যাট আছে। মেয়ে-জামাই সেখানেই থাকে।

—বেশ। মিতিন সোফায় হেলান দিল, এবার বলুন আপনার সমস্যাটা কী?

কথায় কথায় বেশ খানিকটা সহজ হয়েছিল লাবণ্য, আবার চুপ মেরে গেছে। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। হঠাৎই চোখের মণি স্থির করে বলল, আমার খুব বিপদ।

মিতিন মনে মনে বলল, সে আর বলতে! মুখে বলল, কী হয়েছে?

—মাই লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার। আপনি আমাকে বাঁচান, প্লিজ। সামওয়ান ইজ ট্রায়িং টু কিল মি।

—মেরে ফেলতে চাইছে? মিতিনের চোখ সরু, কেন?

—জানি না। তবে আমাকে স্লো-পয়জনিং করা হচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি।

—কী ভাবে?

—আমার স্কিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, দেখুন...। লাবণ্য আচমকা উত্তেজিত মুখে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল, কী রকম র‍্যাশ বেরিয়েছে দেখুন। আরও অনেক জায়গায় আছে। পায়ে, পেটে, বুকে...। বাদামি বাদামি ছোপও পড়ছে। ঘাড়ে, গলায়, কপালে...অথচ তিন-চার মাস আগেও আমার স্কিন কত সুন্দর ছিল। হঠাৎ কেন এ সব হচ্ছে, বলুন?

ঝুঁকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল মিতিন। লাবণ্যর হাতে শুকনো হামের মতো গুঁড়ি-গুঁড়ি দানা ফুটেছে বটে, কিন্তু প্রসাধিত মুখমণ্ডলে ছাপছুপ খুঁজে পাওয়া দায়। মহিলা ম্যানিয়ায় ভুগছে না তো? অতি মাত্রায় রূপ-সচেতন মধ্যবয়সী মহিলারা চামড়া-টামড়ার ব্যাপারে বড্ড বেশি স্পর্শকাতর থাকে। তিলকে তাল করে ফেলে অনায়াসে।

হাল্কা গলায় মিতিন বলল, শুধু এই সব দেখেই আপনি ধরে নিলেন আপনাকে স্লো-পয়জনিং করা হচ্ছে?

—আরও সিম্পটম আছে। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কেমন একটা বমি-বমি ভাব। ওয়েট লুজ করছি। চোখ দুটো হঠাৎ হঠাৎ খুব চুলকোয়। মাঝে মাঝেই জল কাটে।

—তা এ সব তো অনেক কারণেই হতে পারে ম্যাডাম। হঠাৎ বিষের চিন্তাটা আপনার মাথায় এলো কেন?

—কারণ, আমি জানি। কিছুদিন আগে একটা বইতে পড়েছি। ওখানে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের যা যা উপসর্গ লেখা আছে, সব ক'টাই আমার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

ও, এই ব্যাপার? পুঁথি পড়ে ভয়? মিতিনের ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

অমনি লাবণ্যর নজরে পড়েছে হাসিটা। থরথর উত্তেজনা নিবে গেল দুপ করে। মুখ ফ্যাকাশে সহসা। স্তিমিত স্বরে বলল, বুঝেছি। আপনি বিশ্বাস করছেন না। কেউই করে না। এ যে আমি কী জ্বালায় পড়েছি....।

আরতি চা এনেছে। ট্রে থেকে কাপডিশ তুলে লাবণ্যকে বাড়িয়ে দিল মিতিন। হাতে নিল লাবণ্য, তবে ডিশের ওপর কাপ কাঁপছে তিরতির।

মিতিন মৃদু স্বরে বলল, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন মিসেস মজুমদার? বিষ যে আদৌ আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারে আগে ডেফিনিট হোন। ডাক্তার দেখিয়েছেন?

—আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান দেখেছেন। তাঁর মতে মুখ-টুখে এ রকম পিগমেন্টেশন নাকি এই বয়সে হয়েই থাকে। র‍্যাশগুলোও নাকি জাস্ট স্কিন ডিজিজ। কোনও কসমেটিক্স থেকে অ্যালার্জি। একটা মলমও দিয়েছিলেন, লাগিয়েছি। কিস্যু কাজ হয়নি। পরশু অয়েন্টমেন্টটা উনি বদলে দিলেন। লাবণ্যর গলা ফের চড়তে শুরু করেছে। সেন্টার-টেবিলে নামিয়ে

রাখল চা। রাগ রাগ ভঙ্গিতে বলল, ভাবুন...উনি আমার ভমিটিং টেন্ডেন্সিটাকেও পাত্তা দিতে নারাজ। একটা লিভার টনিক লিখে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ। আর চোখের ব্যাপারটা তো উনি শুনলেনই না। আই স্পেশালিস্ট দেখাতে বললেন।

—অর্থাৎ, ডাক্তারবাবু পয়জনিংয়ের সম্ভাবনাটা মানছেন না। তাই তো?

—হুম।

—কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথায় আপনার আস্থা নেই!

—হুম।

—তা হলে সেকেন্ড কাউকে দেখাচ্ছেন না কেন?

—কার কাছে যাই বলুন তো? কে বিশ্বাস করবে? বাড়ির লোকরাই যেখানে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে...

—বাড়ির লোক মানে কে? হাজব্যান্ড?

—মেয়ে-জামাইও আছে। সবার ধারণা, এটা আমার একটা বাতিক। অথচ আমি তো বুঝছি কী ভাবে আমাকে...

মহিলার গলা ধরে এসেছে। নাহ্, এর মাথা থেকে বিষের ভূত নামানো বেশ কঠিন এখন। দু'এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মিতিন গুছিয়ে বসল। মুখে একটা ভারিক্কিভাব ফুটিয়ে বলল, ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনিই ঠিক। কিন্তু পয়জনিং তো ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে জীবন-মৃত্যু জড়িয়ে আছে। অতএব বিষ প্রয়োগের একটা কার্যকারণ থাকবেই। প্রথমে প্রশ্ন আসবে, কে বিষ দিচ্ছে? তার পর দেখতে হবে কেন দিচ্ছে। এবং সব শেষে গিয়ে বার করতে হবে, কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে। তাই তো?

লাবণ্য ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

—আগে তা হলে বলুন কাকে আপনার সন্দেহ হয়?

লাবণ্য চুপ। ঢোক গিলছে।

—কী হল? বলুন?

—সম্ভবত আ-আ-আমার...। লাবণ্য ফের ঢোক গিলল, আমার হাজব্যান্ড।

মিতিন খুব একটা চমকাল না। এ রকমই উত্তর যেন সে আশা করেছিল। নিরুত্তাপ স্বরে বলল, কিন্তু কেন তিনি আপনাকে বিষ দেবেন?

—তা আমি জানি না।

—আপনি মারা গেলে ফিনানশিয়াল ব্যাপারে তাঁর কি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

—নাহ্। তার নিজেরই অনেক টাকা। আমি তো প্লেন হাউস ওয়াইফ।

—আপনার বাপের বাড়ির তরফের কোনও সম্পত্তি...?

—নেই। একখানা আধভাঙা বাড়ি আছে সোদপুরে। ভাই থাকে। সে বাড়ি বেচলেও আমার ভাগে ক'পয়সাই বা আসবে!

—হুম। ...আপনার হাজব্যান্ড কি রিসেন্টলি কোনও মোটা ইনশিওরেন্স করিয়েছেন আপনার নামে?

—না।

—তাঁর কি সম্প্রতি অন্য কারওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক...?

—মনে হয় না। অন্তত আমার জানা নেই।

—অর্থাৎ অ্যাপারেন্টলি তাঁকে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই, অথচ আপনি তাঁকেই সাসপেক্ট করছেন? কেন?

—ইদানীং আমার প্রতি ওর ব্যবহারটা কেমন বদলে গেছে।

—কী রকম?

—ফ্র্যাংকলি বলব?

—অবশ্যই।

—আমি আর অনিমেষ একেবারে ডিফারেন্ট টাইপের। আমি মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসি। ক্লাব-ট্লাবে যাই। বন্ধু-টন্ধুদের সঙ্গে হইহল্লা করি। আর অনিমেষ কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। সে আমার লাইফস্টাইল পছন্দ করে না, আমারও তার সারাক্ষণ কাজ নিয়ে পড়ে থাকাটা ভাল্লাগে না। বেঙ্গালুরুতে থাকতে তো আমাদের এই নিয়ে রেগুলার ফাটাফাটি হত। ভয়ংকর তেতো হয়ে গিয়েছিল সম্পর্কটা। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে রুমকির, মানে আমাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে অনিমেষ যেন আমার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। ভীষণ সফ্‌টলি কথা বলে, কখনও চটে না, ঝগড়া তো নেই-ই প্রায়...এগুলোই কি অস্বাভাবিক নয়? নিশ্চয়ই তলে তলে কোনও মতলব ভেঁজেছে, নইলে হঠাৎ এ রকম আচরণ করবে কেন?

একদমই ঠুনকো যুক্তি। মাথার স্ক্রু বুঝি সত্যিই ঢিলে আছে মহিলার। মিতিন এবার একটু একটু বিরক্ত বোধ করছিল। এর পর মহিলা নির্ঘাত বলবে, যেহেতু বর ছাড়া কেউ সঙ্গে থাকে না, সুতরাং বরই খাবারে বিষ

মেশাচ্ছে! যদিও কাজের লোক থাকে, আছেও নিশ্চয়ই, তাকেও হাত করে নিয়েছে বর! এ সব ফালতু গপ্পো শুনে গোটা সন্ধেটা নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য মিতিন আলগা কৌতূহল দেখাল, আপনার হাজব্যান্ড কী করেন?

—সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বছর ছয়েক হল বেঙ্গালুরুর চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা করছে। ওই লাইনেই। সল্টলেকে সেক্টর ফাইভে অফিস খুলেছে।

—কেমন চলছে বিজনেস?

—ভালোই তো। মাত্র চার বছরের মধ্যে সেকেন্ড ফ্ল্যাটটা কিনে ফেলল। তিনতলার ছোট অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে আমরা আটতলায় উঠে এলাম...

—নীচেরটা বুঝি মেয়ে-জামাইকে যৌতুক দিলেন?

—ঠিক তা নয়। ফাঁকা পড়ে ছিল ফ্ল্যাটটা...ওরা থাকছে...

—জামাইয়ের নিজস্ব বাড়িঘর...?

—ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। পাইকপাড়ায়। ভাবলাম রুমকির হয়তো ওখানে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হবে...রুমকির স্কুলটাও এখান থেকে কাছে হয়...

—কোন স্কুলে পড়ায় আপনার মেয়ে?

—মডার্ন পয়েন্টে। বায়োলজি...।

—মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে আপনার রিলেশন কেমন?

—নর্মাল। রুমকিরা তো সময় পেলেই ওপরে চলে আসে।

—জামাই কী করে?

—তার কারবার শেয়ার-টেয়ার নিয়ে।

—ও। মিতিন দেওয়ালঘড়িতে ঝলক তাকিয়ে নিয়ে মূল প্রশ্নে এলো, এ বার বলুন, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

—কাইন্ডলি একবার আমার ফ্ল্যাটে আসুন। লাবণ্যর স্বর ফের কাতর, মিট অনিমেষ।

—তাতে কী লাভ?

—একটু যাচাই করে দেখবেন। আর আপনার মতো নামী ডিটেকটিভকে দেখলে অনিমেষও নিশ্চয়ই সমঝে যাবে। হোপফুলি আমি বিপদ থেকে মুক্তি পাব।

নেহাতই ছেলেমানুষি চিন্তা। মিতিন হাসবে, না কাঁদবে? তবু পেশার খাতিরে গাম্ভীর্যের মুখোশটা তো রাখতেই হয়। ঠোঁট টিপে মিতিন বলল, সে দেখা যাবে'খন। তার আগে আপনি বরং একটা কাজ করুন। কোনও একটা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে গিয়ে রক্তটা পরীক্ষা করান। আই মিন, ব্লাডে আর্সেনিকের মাত্রাটা। রিপোর্ট যদি অ্যালার্মিং হয়, তখন তো আমি আছিই।

লাবণ্যর চোখ চকচক করে উঠল, দারুণ একটা অ্যাডভাইস দিয়েছেন তো। গুড গুড।

—হ্যাঁ, এতে আপনার সংশয়েরও নিরসন হবে।

—দেখেছেন তো এত সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। ভাগ্যিস আপনার কাছে এসেছিলাম। লাবণ্য উল্লসিত মুখে সুদৃশ্য ভ্যানিটিব্যাগের চেন খুলছে। একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা রাখুন।

মিতিন ভুরু কুঁচকোল, কী আছে এতে?

—আপনার কনসাল্টেশন ফি।

—সে কী? আমি তো কেস এখনও হাতে নিইনি!

—সো হোয়াট? আপনার মূল্যবান সময় তো নষ্ট করেছেন।

—তবু...

—কোনও তবু নেই। এটা আপনাকে নিতেই হবে। প্রায় জোর করে মিতিনের হাতে খামটা গুঁজে দিল লাবণ্য। উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি কিন্তু আপনার কাছে আবার শনিবার আসছি। এই সময়ে।

শনিবার বুমবুমকে নিয়ে হ্যারি পটার দেখতে যেতে হবে, ছেলেকে কথা দিয়েছে মিতিন। ক্যানসেল করলে বুমবুম তুমুল হল্লা জুড়বে। একটু ভেবে নিয়ে মিতিন বলল, আপনি যদি রোববার...সকালের দিকে...

—না, না। অনিমেষ এখন ট্যুরে, শনিবার রাতে ফিরবে। তার আগেই আমি আপনার কাছে আসতে চাই। প্লিজ...শনিবার ইভনিংটা আপনি আমার জন্য ফ্রি রাখুন।

লাবণ্যর অনুনয়ে দোটানায় পড়ল মিতিন। আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আসুন। তার আগে কিন্তু অবশ্যই ব্লাড টেস্টটা...

লাবণ্য চলে যাওয়ার পর মিতিন খুলল খামটা। ন'খানা পাঁচশো টাকার নোট, পাঁচটা একশো। করকরে নতুন। সম্ভবত আসার পথেই এ টি এম থেকে তোলা। বেচারা বরটার কী কপাল। তারই অর্থ ধ্বংস করে তার পিছনে কাঠি দেওয়ার তোড়জোড় চালাচ্ছে ম্যানিয়াক বউ।

রাতে খেতে বসে পার্থকে লাবণ্যর গল্প শোনাচ্ছিল মিতিন। পার্থ তো বেজায় মজা পেয়েছে। ঝটিতি ঘোষণা করে দিল, শনিবার প্রেস-টেস বন্ধ করে চারটের মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাবে। ছিটিয়াল, পতিবিদ্বেষী মহিলাটিকে দর্শনের সুযোগ সে ছাড়বেই না।

কিন্তু শনিবারের আগেই জোর চমক। শুক্রবার রাতে টেলিভিশনের বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলোয় ভেসে উঠল এক দুঃসংবাদ। মধ্যবয়সী মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু! গড়িয়াহাটের এমারেল্ড টাওয়ারের আটতলায়।

মিতিন স্তম্ভিত। এমন ধাক্কা সে আগে কখনও খায়নি।

দুই

দশটা নাগাদ থানায় ঢুকল মিতিন। অফিসার-ইন-চার্জ সুবীর হালদারকে ফোন করাই ছিল, মিতিনকে দেখেই তার পুলিশি গলা গমগম, আসুন, আসুন ম্যাডাম। আপনার জন্যই ধূপধুনো জ্বালিয়ে বসে আছি।

—আমার সৌভাগ্য। মিতিন চেয়ার টেনে বসল, লাবণ্যদেবীর বডি কি পোস্টমর্টেমে চলে গেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এতক্ষণে বোধহয় পুলিশ মর্গ থেকে বেরিয়ে কাঁটাপুকুরের টেবিলে।

—পি-এম রিপোর্ট কবে পাচ্ছেন?

—মঙ্গলবার, কিংবা বুধ। বড়সড়ো টেবিলের ওপারে ঘুরনচেয়ারে উপবিষ্ট দশাসই চেহারার সুবীর ঝুঁকল সামান্য। মোটা মোটা ভুরু নাচিয়ে বলল, ব্যাপার কী বলুন তো? কাল রাত্তিরে ফোন....আজ সকালে ফোন...মহিলা কি আপনার চেনা-জানা?

—একেবারে অপরিচিত আর বলি কী করে? মিতিন অল্প হাসল, ভদ্রমহিলা এই বুধবারেই তো আমার কাছে এসেছিলেন।

—তাই নাকি?

—হুঁ। বলছিলেন ওঁকে নাকি স্লো-পয়জনিং করা হচ্ছে।

—ইন্টারেস্টিং! সুবীর চোখ পিটপিট করল, জানেন তো, আমিও কাল স্পটে গিয়েই গন্ধ পেয়েছি। জরুর ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

—কী রকম?

—অ্যাপারেন্টলি সুইসাইড কেস। নিজের বিছানায় হাত-পা বেঁকিয়ে পড়ে আছে, মুখে গ্যাঁজলা...। কিন্তু ওদিকে আবার ড্রয়িংরুমের টেবিলে আধ গ্লাসের ওপর হুইস্কি। আত্মহত্যার আগে কেউ অতটা মাল ফেলে রেখে যায়, বলুন? টেনশনেই তো ঢকাস করে গলায় ঢেলে দেবে। প্লাস, কিচেনের সিংকে আর একটি গ্লাস নামানো। ফাঁকা, তবে আমি ডেফিনিট ওতেও ড্রিংকস ছিল। হাইলি ফিশি।

—অর্থাৎ আপনি বলছেন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আরও একজন কেউ ড্রিংক করছিলেন?

—অথবা করেছিলেন।

—কিন্তু গ্লাসটা সিংকে ফেলে যাবে কেন? ধুয়ে-মুছে জায়গা মতন রেখে দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। অফ-কোর্স যদি সে-ই মার্ডারার হয়। মিতিন আপনমনেই যেন বিড়বিড় করল কথাগুলো। কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে বলল, বাই দা বাই, আপনারা নিউজটা পেলেন কখন?

—অ্যারাউন্ড সাড়ে সাতটা। মহিলার হাজব্যান্ড থানায় ফোন করেছিল।

পলকের জন্য মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ। পরক্ষণে স্বাভাবিক স্বরে বলল, উনিই কি প্রথম ডেডবডিটা দেখেন?

—না। ওদের কাজের মেয়ে। কোথায় যেন চরতে বেরিয়েছিল, ফিরে দেখে ওই কাণ্ড। তারপর মেয়েটাই হল্লা জুড়ে ফ্যামিলির লোকজনকে ডাকে।

—মৃত্যুর টাইমটা জানা গেছে?

—পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে।

—হুম। মিতিন একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, খুব খারাপ লাগছে, জানেন। ভদ্রমহিলা আমার হেল্প চাইলেন, অথচ ভাল করে কিছু বোঝার আগেই উনি...

—তাই বুঝি মর্মপীড়ায় ভুগছেন?

—একদম ঠিক। এখন আপনাদের পাশে পাশে আমিও একটা ইনভেস্টিগেশন চালাতে পারলে মানসিক শান্তি পাই। অফ-কোর্স আপনাদের কো-অপারেশনও দরকার।

—দেখুন ঘাঁটাঘাঁটি করে। সুবীর মুচকি হাসল, তবে আপনাদের লাবণ্য মজুমদার সম্পর্কে রিপোর্ট কিন্তু খুব খারাপ। স্বভাবচরিত্র নাকি মোটেই

সুবিধের ছিল না মহিলার। যদ্দুর খবর পেয়েছি, অত্যন্ত ফাস্ট লাইফ লিড করত। রেগুলার ক্লাব, পার্টি, হাঁসের মতো মাল টানা, রাতদুপুরে বেহেড হয়ে ফেরা, আটচল্লিশ বছর বয়সেও কচি ছেলে ধরার জন্য ছোঁকছোঁক—গুণের সৌরভে একেবারে ম ম। এই টাইপের মহিলারাই তো বেঘোরে মরে।

—তা বলে কেউ তাকে মেরে ফেলবে, এটাও নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া যায় না?

—অফ কোর্স নট। হোমিসাইড প্রমাণ হলে আমরাও কোমর বেঁধে লাগব বই কী! হুইস্কি আর গ্লাস দুটো ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পি-এম রিপোর্টটাও হাতে আসুক...

সুবীরের সঙ্গে আরও দু'চারটে কথা বলে উঠে পড়ল মিতিন। সকাল থেকে বেশ মেঘ করেছে আজ। ভাদ্রের শুরুতে আকাশ ক'দিন দারুণ ঝকঝকে ছিল, এখন আবার বৃষ্টি হচ্ছে মাঝেসাঝে। রাস্তায় নেমে মিতিন দেখে নিল ব্যাগে ছাতাটা আছে কি না। হাঁটছে চিন্তিত মুখে।

থানা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব বেশি নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে মিতিন পৌঁছে গেছে এমারেল্ড টাওয়ারে। খাড়া দশতলা আবাসনটির গেটে নিরাপত্তারক্ষীর বেজায় কড়াকড়ি। বহিরাগতদের নাম-ঠিকানা গন্তব্য লিখে ঢুকতে হয়। রীতিপ্রকরণের বেড়াটুকু টপকে মিতিন যখন লাবণ্যদের ফ্ল্যাটে বেল বাজাল, ঘড়ির কাঁটা তখন এগারোটা ছুঁয়েছে।

দরজা খুলেছে এক মাঝবয়সী পুরুষ। সাদামাটা, বিশেষত্বহীন চেহারা। চোখে চশমা, মাথায় উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখে একটা দিশেহারা ভাব।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করার আগে মিতিনই সপ্রতিভ স্বরে বলে উঠল, নমস্কার। আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। থার্ড-আই থেকে আসছি। আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার মজুমদার? আই মিন, লাবণ্যদেবীর হাজব্যান্ড?

—আবার মিডিয়া? অনিমেষ হাত জোড় করল, কাল রাত থেকে তো অনেক হল, এবার একটু ছাড়ান দিন না, প্লিজ।

—ভুল করছেন স্যার। আমি মিডিয়ার লোক নই। মিতিন বিনয়ী সুরে বলল, আমি একজন পেশাদার গোয়েন্দা।

—ও। তা এখানে কী চাই?

—জাস্ট দু'চারটে প্রশ্ন ছিল। যদি কাইন্ডলি একটু সময় দেন...। মিতিনের গলা আরও নরম, আসলে দিন তিনেক আগে লাবণ্যদেবী আমার কাছে এসেছিলেন তো...

—লাবণ্য আপনার কাছে গেছিল? কেন?

—সেটা নিয়েই তো আলোচনা করতে চাইছিলাম। জানি খুব অসময়ে এসেছি, লাবণ্যদেবীর এখনও ক্রিমেশান হয়নি, তবু...

দু'চার সেকেন্ড থমকে রইল অনিমেষ। একটু বুঝি জরিপও করল মিতিনকে। ভারী গলায় বলল, আসুন।

লিভিংরুমখানা বিশাল। বিদেশি সোফাসেট, পুরু কার্পেট, কোণে রাখা স্ট্যান্ডল্যাম্প, বড়সড়ো ঝাড়বাতি, নামী আর্টিস্টদের পেন্টিং, মহার্ঘ পর্দা আর তামা-ব্রোঞ্জ-পিতলের ছোটবড় শো-পিস থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে বৈভবের দ্যুতি। তবে ঘরের অঙ্গসজ্জা যেন সম্পদের সঙ্গে মানানসই নয়। একটু বা ছন্নছাড়া। অন্তত তেমনটাই মনে হল মিতিনের। অদূরে প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিল। রান্নাঘরের একটা অংশও যেন দেখা যায়। বন্ধ কাচের দরজার ওপারে ব্যালকনিও দৃশ্যমান। স্প্লিট এসি মৃদু-মৃদু ঠান্ডা ছড়াচ্ছে হলে।

কাচের সেন্টার টেবিলে আলগা চোখ বুলিয়ে মিতিন বলল, লাবণ্যদেবী আমাকে মিট করেছিলেন বুধবার। সম্ভবত আপনি তখন কলকাতায় ছিলেন না।

—হ্যাঁ। হায়দরাবাদে গিয়েছিলাম। বিজনেস ট্যুর।

—উনি আজ বিকেলে আবার আমার কাছে যাবেন বলেছিলেন। আর আপনার বোধহয় আজ রাতে ফেরার কথা।

—কাজ মিটে গেল, তাই চলে এলাম। অনিমেষ একটু যেন থতমত। কেন বলুন তো?

—লাবণ্যদেবীর আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু একটা অভিযোগ ছিল। মিতিন স্থিরচোখে তাকাল, আপনি নাকি ওঁকে...

—বুঝেছি। স্লো-পয়জনিং করছিলাম তাই তো? অনিমেষ তেতো স্বরে বলল, ওর মাথাটা ইদানীং একেবারেই গিয়েছিল।

—আমারও অবশ্য লাবণ্যদেবীকে খুব নর্মাল লাগেনি। তবে শনিবার... মানে আজ... আমার কাছে সেকেন্ড ভিজিটের আগেই দুম করে উনি মারা গেলেন... এটা কি একটু মিস্টিরিয়াস লাগে না?

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ইঙ্গিতটা আমি বুঝেছি। অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। বাঁ হাতের তর্জনী তুলে বলল, শুনুন, আমার স্ত্রী ছিল এক সাইকিক পেশেন্ট। মুঠো মুঠো ডিপ্রেশনের ওষুধ খেত সে। বিশ্বাস না হয়, আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। আপনারা কেন যে রহস্য খুঁজছেন জানি না। তবে যারা লাবণ্যকে কাছ থেকে দেখেছে, তারা একবাক্যে বলবে, ডিপ্রেশনের ঝোঁকে কিছু একটা খেয়ে আত্মহত্যা করা তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

—অর্থাৎ আপনি সিওর, লাবণ্যদেবী সুইসাইড করেছেন?

—আর কী হতে পারে?

—পুলিশ কিন্তু ফ্ল্যাটে দুটো গ্লাস পেয়েছে। একটায় হুইস্কি ছিল, একটা ফাঁকা।

কথাটায় হঠাৎই থম মেরে গেল অনিমেষ। খানিক পরে নিচু গলায় বলল, দেখুন, আপনার কাছে সে গিয়েছিল বলেই বলছি। আমার স্ত্রী ছিল অ্যালকোহলিক। ইন ফ্যাক্ট; মদের নেশাই তার মানসিক রোগের কারণ। ফ্ল্যাটে যখন-তখন সে বোতল খুলে বসে যেত। হয়তো কালও...

—কিন্তু সিংকে ফাঁকা গ্লাস গেল কী করে?

—বলতে পারব না। তবে নেশার সময়ে তো তার হুঁশ থাকত না... একটা গ্লাস রেখে এসে আর একটা গ্লাসে হয়তো ড্রিংকস ঢেলেছে।...কী যে পাগলামি করত, আর কী করত না, তার সবকিছু আপনাকে বলতে পারব না। এই মুহূর্তে বলাটা শোভনও নয়। শুধু একটা কথাই বলতে পারি, শি ওয়াজ নট অ্যাট অল নর্মাল।

—স্লো-পয়জনিংয়ের আতঙ্কটা তবে সেই অস্বাভাবিকতারই লক্ষণ?

—অবশ্যই। কে তাকে মারতে যাবে বলুন? কেন মারবে? কী হবে মেরে?

—হুম। মিতিন মাথা নাড়ল, ওই আতঙ্কটা কাটানোর জন্যে আমি ওঁকে একটা রক্ত পরীক্ষা করতে বলেছিলাম। আর্সেনিক টেস্ট। বৃহস্পতি-শুক্রর মধ্যে রিপোর্ট এসে যাওয়ার কথা। রিপোর্টটা আনা হয়েছিল কি না বলতে পারেন?

—না। আমি তো ব্যাপারটা জানিই না। তবে পুলিশ কাল তন্নতন্ন করে সব খুঁজছিল। পেলে তো নিয়েই যেত।

—তা অবশ্য ঠিক।...আর একটা কোয়েশ্চেন। লাবণ্যদেবীর মৃত্যুর খবরটা যখন পান, তখন নিশ্চয়ই আপনি অফিসে?

—হ্যাঁ। এগারোটা, সওয়া এগারোটা নাগাদ ফিরলাম হায়দরাবাদ থেকে। তারপর বাড়িতে ঘণ্টা দুয়েক রেস্ট নিয়েই তো বেরিয়ে গেছি।

—তখন লাবণ্যদেবী কী করছিলেন?

—ঘরেই ছিল। আয়নার সামনে বসে কী সব মাখছিল মুখে।

—তার মানে তখনও উনি নর্মাল মুডে?

—জানি না। এত জেরা করছেন কেন, অ্যাঁ? অনিমেষ হঠাৎই অস্থির। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে বলল, আপনি এখন আসুন তো। বাড়িতে ভিড় হয়ে যাওয়ার আগে আমাকে খানিকক্ষণ একা থাকতে দিন।

—সরি, সরি। মিতিনও উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে যেতে গিয়েও ঘুরে তাকিয়েছে, আপনার মেয়ে-জামাই কি বডি আনতে গেছেন?

—আরও অনেকেই আছে সঙ্গে। আমার শ্যালক, প্লাস কয়েকজন বন্ধু, রিলেটিভ...

—আপনাদের কাজের মেয়েটিকে দেখলাম না তো! সে কোথায়?

—মালতী? সম্ভবত নিজের ঘরে।

—তার সঙ্গে একটু কথা বলা যায়?

—ওকেও জ্বালাবেন? অনিমেষের গলায় ঝাঁঝ, আমার সারভেন্টস রুমে বাইরে থেকেও ঢোকা যায়। বেরিয়ে বাঁ-সাইডে দরজা আছে, সেখানে নক করুন। অনুগ্রহ করে মাথায় রাখবেন, পুলিশ ওকে যথেষ্ট হ্যারাস করেছে, শি ইজ ইন স্টেট অব শক।

সত্যিই যেন ঘাবড়ে আছে মালতী, মুখে প্রায় কথা ফুটছে না। মিতিন পুলিশের লোক নয় জেনে খানিকটা যেন আশ্বস্ত হল বছর কুড়ির স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি। ছোট্ট ঘরের সরু তক্তপোশে বসতে বলল মিতিনকে। প্রায় আসবাবহীন ঘর। বেঁটে একখানা আলমারির মাথায় আয়না, আর সাজগোজের নানান সরঞ্জাম। আলনায় ঝুলছে জামাকাপড়। সস্তার নয়, সালোয়ার-কামিজগুলো বেশ দামি।

মিতিন কোমল গলায় বলল, তুমি নার্ভাস হয়ো না। ভেবেচিন্তে আমায় খালি দুটো-চারটে উত্তর দাও।...কাল তুমি কখন দেখলে উনি মারা গেছেন?

—আমি প্রথমটা বুঝিনি উনি বেঁচে নেই। ঘরে ঢুকে পেছন দরজাটা দিয়ে ওদিকে গেছি...দেখি মামি কেমনভাবে যেন পড়ে আছে বিছানায়, কষ

বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দিদি-জামাইবাবুকে ফোন করলাম। ওরা এসে বলল...

—ওরা দেখেই বুঝে গেল লাবণ্যদেবী মারা গেছেন?

—না, না। দিদি তো প্রথমে মামির হাতটা তুলে নাড়ি দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা কেমন হয়ে গেল দিদির। বলল, সর্বনাশ, বডি তো ঠান্ডা!

—তারপর?

—দিদি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছে ডাক্তারবাবুকে। জামাইবাবু মামাবাবুকে। দু'জনেই এসে পড়ল দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-টরীক্ষা করে বলল, অনেকক্ষণ আগেই নাকি মরে গেছে। উনিই তো মামাবাবুকে বলল, পুলিশে খবর দিন, মৃত্যুটায় গণ্ডগোল আছে। মামাবাবুর তখন কী করুণ দশা। কতবার ডাক্তারবাবুকে বলল, পুলিশের ঝামেলায় গিয়ে কী লাভ...জানেনই তো মাথার গোলমাল ছিল...এখন পুলিশ এলে চারদিকে তো শুধু কাদা ছিটবে...। তাও ডাক্তারবাবুটা কিছুতেই সার্টিফিকেট দিলেন না।

মেয়েটা দিব্যি গুছিয়ে কথা বলছে এখন। আড়ষ্টতা বুঝি কেটেছে। মিতিন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মালতী, তোমার কী মনে হয়? তোমার মামির মাথায় কি সত্যিই গোলমাল ছিল?

—কী জানি বাপু পাগল কাকে বলে! মালতী ঠোঁট উল্টোল, তবে হঠাৎ হঠাৎ খেপে যেত খুব। শ্রীরাধিকে তখন মা চণ্ডী। হাত-পা ছুঁড়ছে, আছড়ে আছড়ে জিনিসপত্তর ভাঙছে...

শ্রীরাধিকে শব্দটা কানে লাগল মিতিনের। মালতীর বাচনভঙ্গিও। কয়েক পল মালতীকে দেখে নিয়ে বলল, কালও কি উনি কোনও কারণে মাথা গরম করেছিলেন?

—না, না। কাল তো মনমেজাজ ভালই...। অবশ্য দুপুরের পর কী হয়েছে বলতে পারব না।

—কেন?

—দুপুর দুটোর পর তো আমি বেরিয়ে গেছি।

—কোথায়?

—বাড়ি। পঞ্চাননতলায়। শুকুরবার করে দুপুরে যাই। ফিরি সেই সন্ধেয়।

—প্রত্যেক শুক্রবার? সেই যবে থেকে কাজ করছ?

—এ বাড়িতে তো বেশি দিন আসিনি। জোর পাঁচ মাস।

—ও। মিতিনের ভুরু ফের জড়ো হয়েছে, কাল কখন ফিরেছিলে?

—সাড়ে ছ'টা হবে।

—দুপুরে যখন বেরলে, মামাবাবু বাড়িতে ছিলেন?

—না। তার আগেই তো খেয়েদেয়ে অফিস চলে গেল। বলতে বলতে মালতী আচমকা মিতিনের হাত চেপে ধরেছে, বিশ্বাস করুন দিদি, মামাবাবুর কিন্তু কোনও দোষ নেই। মানুষটা বড় ভাল। প্রাণে খুব দয়ামায়া।

—তাই বুঝি? মিতিন ঝলক চোখ বোলাল আলনায়। খানিক তির্যক সুরেই বলল, তোমার ড্রেসগুলো ভারি সুন্দর। কে দিয়েছে? তোমার মামাবাবু?

—এগুলো বেশির ভাগই দিদির। রুমকিদিদির। আমাকে দিয়েছে।

—ও, আচ্ছা।

—পুলিশ মামাবাবুকে খুব জেরা করেছে দিদি। আমাকেও। আপনারা একটু দেখবেন।

মিতিনকে সম্ভবত খবরের কাগজের লোক বলে ধরে নিয়েছে মালতী। ভুলটা না ভাঙিয়ে মিতিন বেরিয়ে এল। লিফ্‌টে নীচে নেমে গেটের সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরেছে। সিটে হেলান দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিল আজই এমারেল্ড টাওয়ারে ছুটে এসে লাভ হল কি না। কিংবা কতটা হল। নাহ্, ঠাহর করা কঠিন। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সবটাই ধোঁয়া। ততক্ষণ ধৈর্য ধরতেই হবে।

নিস্তরঙ্গ কাটল তিনটে দিন।

বুধবার সন্ধেয় সুবীর হালদারের ফোন, পি-এম রিপোর্ট পেয়ে গেছি ম্যাডাম।

—কী বেরল?

—যা ভেবেছি তাই। বিষেই মৃত্যু। পয়জনিংয়ের এফেক্ট ব্রেনের ভাইটাল সেন্টারে হেমারেজ, কার্ডিয়াক সেন্টারে রক্তসঞ্চালন বন্ধ এবং অক্কা।

—ও। মিতিন নিরুত্তেজ, কী বিষ?

—আর্সেনিকই হবে। হুইস্কিতে মেশানো ছিল। হেভি ডোজে।

—কিন্তু...আর্সেনিকে কি ও-ভাবে গ্যাঁজলা বেরোয়?

—ও সব নিয়ে আপনি ভাবুন। গ্লাসের গায়ে দু'রকম ফিংগারপ্রিন্ট মিলে গেছে। একটা লাবণ্যদেবীর। দু'নম্বরটি কার ধরতে পারলেই কাম ফতে। কাল সকালেই বাড়ির মেম্বারদের হাতের ছাপ নিয়ে নেব। সুবীর গমগম হাসল, কে জানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কী কেউটে বেরয়।

মিতিনের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, কেসটাকে বোধহয় বেশি সরলীকৃত করে ফেলছে সুবীর। তবে তর্কাতর্কিতে গেল না মিতিন। অনুরোধের সুরে বলল, একটা কথা বলি? ভিসেরা রিপোর্টটার জন্য ওয়েট করলে হত না? বিষের নেচারটা তাহলে অ্যাকিউরেটলি জানা যেত।

—অসম্ভব। আমি একটা দিনও নষ্ট করতে রাজি নই। এমনিই তো মিডিয়া সারাক্ষণ পুলিশকে ডলছে...আমরা নাকি গদাইলস্করি চালে হাঁটি...কোনও কম্মের নই...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। যান ও-বাড়ি। তবে কাল সন্ধেয়।

—কেন বলুন তো?

—ভাবছিলাম ফ্যামিলির লোকগুলোকে আর একবার বাজিয়ে দেখি। মিতিনের স্বরে মধু ঝরল, আপনারই কাজের সুবিধে হবে। আগেও তো দেখেছেন, পুলিশি কেসে ইনভল্‌ভড হলেও আমি কোনও ক্রেডিট দাবি করি না। সুতরাং সুনাম হলে তাও তো আপনাদেরই।

—বেশ। দিলাম একটা বেলা। করুন পণ্ডশ্রম।

টেলিফোন রেখে মিতিন গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের জোরে খানিকটা সময় সে পেল বটে, কিন্তু এগোবে কোন পথে?

তিন

আবার এমারেল্ড টাওয়ার। এবার আটতলা নয়, তিনতলায়। ভাদ্রের ভ্যাপসা দুপুর তখন সবে গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলে পৌঁছেছে। ঘড়ির কাঁটায় পাক্কা একশো কুড়ি ডিগ্রি।

বেশ কয়েকবার ফ্ল্যাটের বেল বাজাতে হল মিতিনকে। অবশেষে খুলেছে দুয়ার। এবং সামনে এক রূপবান তরুণ। বয়স তিরিশের আশেপাশে, টকটকে রং, খাড়া নাক, গাঢ় নীল চোখ, পেটা স্বাস্থ্য, উচ্চতা প্রায় ছ'ফুট। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন জীবন্ত গ্রিক ভাস্কর্য। পরনে লাল

শর্টস, হাতাবিহীন হলুদ টি-শার্ট। বুকে নকশা করা লেখা, আই অ্যাম হাংরি। কবজিতে ব্রেসলেটও আছে, এক কানে দুল।

এই নব্য যুবাটি তবে রণজয়? লাবণ্য দেবীর জামাতা?

দরজার পাল্লায় একটা হাত রেখে দাঁড়িয়েছে রণজয়। মিতিনকে এক টুকরো মেয়েপটানো হাসি উপহার দিয়ে বলল, ইয়েস প্লিজ?

মিতিনের পরিচয় শুনেই অবশ্য নিবে গেছে হাসিটা। চোখ পলকে সরু—ও, আপনিই সেদিন ওপরে গিয়েছিলেন? রুমকির মা আপনার কাছেই...?

—হ্যাঁ। আজ দুপুরে ফোনে রুমকির সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। রুমকি আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।

—কিন্তু রুমকি তো এখনও ফেরেনি।

—আমি বোধহয় একটু আর্লি পৌঁছে গেছি। মিতিনের ঠোঁটে আলগা হাসি, ভেতরে একটু ওয়েট করতে পারি?

সামান্য দোনামোনা করে রণজয় পথ ছেড়ে দিল। মিতিন পায়ে পায়ে ঢুকছে অন্দরে। আটতলার মতো প্রকাণ্ড না হলেও লিভিংরুমখানা নেহাত ছোট নয়। সাজসজ্জা বাহুল্যবিহীন। ছিমছাম। তবে সোফায়, আর পর্দার রঙে, টিভি-ক্যাবিনেটে সাজানো সুন্দর সুন্দর শো-পিস, ল্যাম্পশেডে, রুচির ছাপ স্পষ্ট।

রণজয় খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে। জুলজুল চোখে দেখছিল সোফায় বসা আগন্তুককে। মিতিন হেসে বলল, আমি বুঝি আপনাকে ডিসটার্ব করলাম? রুমকি বলছিলেন আপনার নাকি বাড়িতেই অফিস?

মুখভঙ্গি করে রণজয় বলল, তা হলে নিশ্চয়ই এটাও বলেছে, আমার কাজটা কী?

—অন-লাইন শেয়ার ট্রেডিং?

—ইয়েস। ঠিক চারটেয় মার্কেট ক্লোজ হয়। এই সময়টায় আমি সত্যিই ব্যস্ত থাকি।

—তা চারটে তো বেজে গেছে, এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তেমন কাজ নেই?

—উঁহু, আছে। সারাদিনে স্টক ওঠা-পড়ার হালচালটা এই সময়েই স্টাডি করি। ডেলি প্রফিট-লসের হিসেবটা কষতে হয়।

—সে একদিন না হয় পরেই করলেন। বসুন না, একটু গল্প করি।

—বুঝেছি। রণজয়ের ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, আমায় ক্রস করতে চাইছেন।

—বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাও বলতে পারেন। মিতিন রণজয়ের চোখে চোখ রাখল—একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে দিতে পারি।

—কী?

—লাবণ্যদেবীকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।

—খাইয়ে? রণজয় ধপ করে বসে পড়ল—কী করে জানলেন?

—পুলিশ রিপোর্ট। হুইস্কিতে আর্সেনিক ছিল।

—ইজ ইট? রণজয়ের মুখ ফ্যাকাশে—স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

—স্ট্রেঞ্জ বলছেন কেন?

—কে মেশাবে বিষ? কখন মেশাবে?

—কেন, দুপুর দুটোর পর থেকে তো উনি একাই ছিলেন। যে কেউ গিয়ে ওই কাজটি করতে পারে। মিতিন মুখ টিপে হাসল, পুলিশ তো কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না, সন্দেহের তির আপনার দিকেও আসতে পারে।

—কি-কি-কিন্তু আমি তো সারাক্ষণ এই ফ্ল্যাটেই ছিলাম।

—প্রমাণ করতে পারবেন তো?

—অফ-কোর্স। রুমকি সাক্ষী। রণজয় যেন ঈষৎ উত্তেজিত—রুমকি আমায় চারটেয় ফোন করেছিল। দশ মিনিট পর তার সঙ্গে আবার আমার কথা হল...

—মোবাইলে? না ল্যান্ডলাইনে?

—প্রথমবার মোবাইল। নেক্সট টাইম ল্যান্ডলাইনে। ওর কাছে একটা লোক আসার কথা ছিল। ইনসিয়োরেন্সের এজেন্ট। আমাকে বসাতে বলেছিল। সে বোধহয় এল সাড়ে চারটের আগে। তার সঙ্গে বসে কথা বলছি, রুমকি ফিরল স্কুল থেকে।

—আর দুটো থেকে চারটে?

—আশ্চর্য, আমি তো জানি না উনি সেদিন মারা যাবেন! তাহলে নয় পাঁচটা বন্ধুকে ডেকে সারাদিন বাড়িতে বসিয়ে রাখতাম। রণজয়ের সুন্দর মুখখানা কেমন বিকৃত দেখাল। দু'হাত ঝাঁকিয়ে বলল, তা ছাড়া উনি তো মারা গেছেন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটায়। তখন তো আমি, রুমকি, ইনসিওরেন্সের লোকটা, সবাই এ ঘরে।

—বটেই তো। বটেই তো। মিতিনের স্বর শান্ত—আসলে আপনি কাছাকাছি থাকেন বলেই প্রশ্নটা মাথায় এল।

—কাছাকাছি মানে? রণজয় দপ করে জ্বলে উঠেছে—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—আহা, এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন? আপনারা সেম প্রেমিসেসের বাসিন্দা, নিশ্চয়ই ওপরতলায় আপনার যাতায়াতও আছে...

—তো? দুপুরে কাজকর্ম ফেলে আমি তার ঘরে বসে ড্রিংক করব?

—আমি তো বলিনি আপনি ড্রিংক করছিলেন। জাস্ট একটা সম্ভাবনা...

—কীসের সম্ভাবনা? আমি গ্লাসে বিষ মিশিয়েছি? কেন, লাবণ্য মজুমদার মারা গেলে আমার কী লাভ?

—সরি। আমি কিন্তু আপনাকে হার্ট করতে চাইনি।

রণজয় তবু গজগজ করছে, কাছাকাছি তো অনেকেই থাকে। রুমকির বাবা, মালতীদেরই বা বাদ দিচ্ছেন কেন? লাবণ্য মজুমদার তো স্লো-পয়জনিংয়ের ব্যাপারে নাকি হাজব্যান্ডকেই সন্দেহ করতেন?

—ডোন্ট ওরি, আমাদের সবই স্মরণে আছে। তবে পুলিশ-ডিটেকটিভদের কাছে সকলেই সাসপেক্ট। আমাদের নজরটাই বাঁকা কিনা। মিতিন ফের হাসল—যাকগে ও-সব কথা। এবার সত্যি-সত্যিই গল্প করি। আপনি এক্সাইটমেন্ট খুব ভালবাসেন, তাই না?

—এমন অনুমানের কারণ?

—আপনার শেয়ার মার্কেটে ইন্টারেস্ট দেখে মনে হল।

—ভুলে যাচ্ছেন, এটাই আমার রুটিরুজি।

—হয় ভাল রোজগারপাতি? শুনেছি এতে ভীষণ রিস্ক? দু'টাকা এলে দশ টাকা বেরিয়ে যায়?

—টাকা তো আসা-যাওয়ার জন্যই। হু কেয়ারস।

কথার মাঝেই রুমকি এসে পড়েছে। লাবণ্যর সঙ্গে মিল নেই মেয়ের, চেহারাটা বরং বাবা ঘেঁষা। টেনেটুনে সুশ্রী বলা যায়। বছর পঁচিশেকের ছোট্টখাট্টো রুমকির পোশাক-আশাক, হাবভাব, সবই লাবণ্যর বিপরীত। চোখেমুখে বিষণ্ণতার আভাস। সদ্য মা হারিয়েছে বলে কি? না রুমকি এ রকমই?

একটু যেন নিস্তেজ গলাতেই রুমকি জিজ্ঞেস করল—অনেকক্ষণ এসেছেন?

—এই তো মিনিট কুড়ি-পঁচিশ। মিতিন ভদ্রতা করে হাসল, আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম।

—চা খাবেন?

—নো, থ্যাংকস। মিতিন গলার ওজন বাড়াল। লালবাজারে ডিসি-ডিডির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখানকার কাজ সেরে চটপট বেরতে হবে।

—ও। রুমকি কাঁধের ঝোলা-ব্যাগ টেবিলে রেখেছে। তাপহীন স্বরে রণজয়কে বলল, যদি চাও...এবার তোমার কাজে যেতে পারো।

—হুঁ। যাই।

খানিকটা যেন অন্যমনস্ক মুখে উঠে গেল রণজয়। তেরচা চোখে তার যাওয়াটা দেখে নিয়ে মিতিন বলল, আপনার হাজব্যান্ড মানুষটা কিন্তু বেশ।

ঝাপসাভাবে হাসল রুমকি। অস্ফুটে বলল, থ্যাংকস।

—আপনাদের কি লাভ-ম্যারেজ?

—পুরোপুরি নয়। রুমকি সামান্য থেমে থেকে বলল, একটা লেডিজ ক্লাবের ফাংশনে মা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর বাড়িতে রণজয়ের আসা-যাওয়া শুরু হল...নিজেই একদিন বিয়ের কথা তুলল...

—আপনিও নিশ্চয়ই এক কথায় রাজি?

রুমকির ঠোঁটে আবার একটা আবছা হাসি, মা-ও খুব চেয়েছিল আমাদের বিয়েটা হোক।

—বাহ্, বেশ। মিতিন সোজা হল, তা আপনার মা-র পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম তো সব মিটে গেছে। তাই না?

—হ্যাঁ। অপঘাতে মৃত্যু...তিন দিনে কাজ...

—অপঘাতের নেচারটা তো তখন ফোনে বললামই। পুলিশের সন্দেহটাও।

—আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। রুমকির গলায় যেন কান্না, কে এই কাজ কবল বলুন তো? কেন করল?

—সে প্রশ্ন তো আমাদেরও।...আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?

—কাকে সন্দেহ করব?

—কোনও আত্মীয়স্বজন? বন্ধুবান্ধব?

—আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই। একমাত্র মামাই যা আসে কালেভদ্রে। মা-র বন্ধুরাও তো বাড়িতে আসত না বিশেষ। তাদের সঙ্গে মা-র দেখাসাক্ষাৎ তো সব বাইরে বাইরে। কখনও যদি মা বাড়িতে পার্টি-টার্টি দিল তো...

—ওই দিন তো সে-রকম কিছু ছিল না। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় তাদের কেউ আসেনি?

—বটেই তো। এলে তো মালতীর কাছে শুনতাম।

—কিন্তু মালতী তো দুটোয় চলে গেছে। তারপর যদি কেউ...

—সেটা অবশ্য হতে পারে। ...দুটো হুইস্কির গ্লাসও তো পাওয়া গেছে।

—এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? যার সঙ্গে বসে আপনার মা ড্রিংক করছিলেন?

—সরি। বলতে পারব না।

—আপনি নিশ্চয়ই জানতেন লাবণ্যদেবী স্লো-পয়জনিংয়ের আতঙ্কে ভুগছিলেন?

—জানি। ওটা মা-র এক ধরনের মেন্টাল ফিক্সেশান ছিল।

—তিনি কিন্তু বিশেষ একজনকে সন্দেহও করতেন।

—বাবাকে তো? রুমকি হঠাৎই অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকাল, অসম্ভব। একেবারেই ভিত্তিহীন ধারণা।

—লাবণ্যদেবী কিন্তু আমায় বলেছিলেন হাজব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না।

—মা কী বলেছে জানি না, তবে...বাবা মাকে ভীষণ ভালবাসত। নইলে আঠাশ বছর মা-র সঙ্গে ঘর করতে পারত না। জোরের সঙ্গে বলতে পারি, মা-র মৃত্যুকামনা করা বাবার পক্ষে অসম্ভব।

—হুম। মিতিন নড়ে বসল, আচ্ছা, ঘটনার দিন কি লাবণ্য দেবীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

—প্রায় রোজই স্কুল বেরনোর আগে একবার ওপরে ঘুরে যাই। সে-দিনও গিয়েছিলাম।

—তখনও তো অনিমেষবাবু ফেরেননি, তাই না?

—বাবা বোধহয় এগারোটা নাগাদ এসেছিল। দুপুরে মাকে ফোন করেছিলাম, তখনই শুনি।

—দুপুরে? ক'টায়?

—স্কুলের টিফিনটাইমে। ধরুন পৌনে দুটো।

—রোজই বুঝি দুপুরে ফোন করতেন?

—না। মাঝে মাঝে। তবে শুক্রবারটা করতামই। মালতী দুপুরে চলে যায় তো, তাই...

—সে-দিন মালতী তখনও ছিল?

—হ্যাঁ। মা বলল, এবার বেরবে।

—ও।...তা বিকেলে তো আর মা-র কাছে যাননি? একেবারে সন্ধেবেলায়...

—মালতীর ডাক পেয়ে। গিয়ে মা-র হাতটা ধরতেই ঝটকা খেয়ে গেলাম। দেখি একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে।

—এবং তক্ষুনি আপনারা ফোন-টোন শুরু করলেন?

—হ্যাঁ। আমার ফোন পেয়েই বাবা এসে গেল। তার পরে পরেই ডাক্তারবাবু।

—অনিমেষবাবু নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়েছিলেন?

—এ কী আর বলার অপেক্ষা রাখে! এলই তো প্রায় উদভ্রান্তের মতো। ছুটতে ছুটতে বোধহয় দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই।

—তাই? মিতিনের দৃষ্টি পলকের জন্য তীক্ষ্ণ। পলকে গলা স্বাভাবিক করেছে। সহজ সুরে বলল, ওকে। আপাতত আর কিছু জানার নেই। ... মালতীকে এখন নিশ্চয়ই ওপরে পাব?

রুমকি অস্ফুটে বলল, এখন ওপরেও যাবেন?

—যাই এক বার। দু'একটা ছোটখাটো ব্যাপার জানার আছে।

মিতিন উঠে দরজার দিকে এগোল। দুঃখী-দুঃখী মুখে রুমকি আসছে পিছন পিছন। হঠাৎই নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল, ম্যাডাম, খুনি ধরা পড়বে তো?

—চেষ্টা তো করছি।

—আচ্ছা, যে গ্লাস দুটো পুলিশ নিয়ে গেছে, তাতে কারও হাতের ছাপ...? মানে ও-সব দিয়েও তো ধরা যায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিন ঝলক দেখল রুমকিকে। হেসে বলল, হ্যাঁ, তা তো যায়ই। পুলিশ সবই দেখবে।

বলেই মিতিন সোজা করিডোরে। তার পর লিফ্ট ধরে সটান আটতলায়।

ফাঁকা ফ্ল্যাটে টিভি দেখছিল মালতী। মিতিনকে দেখে বেশ চমকেছে। অবাক মুখে বলল, দিদি আপনি? আবার?

—তোমার রুমকিদিদির কাছে এসেছিলাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গেও একটু দেখা করে যাই।

—বসুন।

—না মালতী, বসার সময় নেই। মিতিন মালতীর কাঁধে হাত রাখল, তোমায় শুধু একটা কথা জানানোর ছিল।

—কী দিদি?

—তোমার মামি কিন্তু আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—অ্যাঁ? মালতী প্রায় আঁতকে উঠেছে, কে মারল?

—এমন একজন, যে তুমি না-থাকার সময়ে এসেছিল। মিতিনের স্বর শীতল, অবশ্য তুমিও যে দুপুরবেলা ফ্ল্যাটে ছিলে না, তার কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই।

—কী বলছেন দিদি? মালতীর মুখ সাদা হয়ে গেল, বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক দুটোয় বেরিয়েছি। বাড়িতে গেছিলাম...

—সে তোমার পঞ্চাননতলায় খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

—আপনি আমার বাড়িতে যাবেন নাকি?

—পুলিশ যাবে। তারা তো সব কিছু ভাল করে বুঝে নেবে।

—তাই? মালতী ঝপ করে মিতিনের হাত চেপে ধরেছে, আমাকে বাঁচান দিদি। ...আ-আ-আমি সে-দিন বাড়ি যাইনি।

—তার মানে ফ্ল্যাটেই ছিলে?

—না-আ-আ। আমি সেদিন সিনেমায় গিয়েছিলাম। দিলীপের সঙ্গে।

—কে দিলীপ?

—ইলেকট্রিকের কাজ করে। এ পাড়ায় দোকান আছে।

—হুম। ধরে নিলাম তুমি সত্যি বলছ। মালতীকে আপাদমস্তক জরিপ করে নিয়ে মিতিন ফের বলল, কিন্তু পুলিশ তো ছাড়বে না। তোমার কাছেই জানতে চাইবে, দুপুর-বিকেলে কেউ ফ্ল্যাটে আসত কি না, সে-দিনই বা কে এসে থাকতে পারে, তোমার তার কোনও যোগসাজশ ছিল কি না...

—মা কালীর দিব্যি, আমি ও-সবে নেই। কিচ্ছু জানি না।

—তা বললে চলবে! তুমি রাতদিনের লোক...

—বিশ্বাস করুন দিদি, এমনি দিনে কেউ দুপুরে আসত না। বেশির ভাগ দিন মামিই তো বাইরে বাইরে। তবে শুক্কুরবার...

—থেমে গেলে যে বড়?

—না মানে...। মালতী ঢোঁক গিলল, সে-দিন তো আমি থাকি না, বল' কেমন করে কী হত!

পরিষ্কার বোঝা যায়, মালতী কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে। কাকে আড়াল দিতে চায়? মিতিন অবশ্য চাপাচাপিতে গেল না আর। ভূতলে নেমে ঢুকেছে সিকিউরিটির কুঠুরিতে। ব্যাগ থেকে পরিচয়পত্র বার করে দিয়ে বলল, একটা জরুরি খবর দরকার।

সবুজ উর্দি নিরাপত্তারক্ষীটি ঈষৎ তটস্থ, বলুন?

—গত শুক্রবার আটশো চার নম্বর ফ্ল্যাটে কে কে এসেছিল? দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে?

—কেউ আসেনি। শুধু কাজের মেয়েটা বাইরে গিয়েছিল। তখন বোধহয় দুটো বাজে। তারপর তো সন্ধেবেলা ফিরে দেখে...

—মাঝে মেয়েটা একবারও আসেনি?

—না ম্যাডাম? এলে চেখে পড়ত।

—ওদের বাড়ির আর সবাই? অনিমেষবাবু? তাঁর মেয়ে? জামাই? তারা কে কখন...?

—দিদিমণি তো বিকেলে স্কুল থেকে এলেন। যেমন আসেন। দাদা বেরয়নি। বলতে বলতে যুবকটির কপালে ভাঁজ, হ্যাঁ, অনিমেষ স্যার চলে গিয়েও একবার ফিরে এলেন।

—তাই? কখন?

—টাইমটা নিখুঁত মনে নেই ম্যাডাম। সাড়ে তিনটে চারটে হবে। এখানকার বাসিন্দাদের ঢোকা-বেরনো তো অত খেয়াল করি না...। তবে অনিমেষ স্যার একটু পরেই আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি ছাড়াই। হেঁটে হেঁটে।

এতক্ষণে মিতিনের সামনে যেন আলোর আভাস। হিসেব বোধহয় এবার মিলবে আস্তে আস্তে।

চার

বুমবুমদের স্কুলে একটা অনুষ্ঠান ছিল আজ। নাচ গান নাটক আবৃত্তি মিলিয়ে রীতিমতো জমজমাট ব্যাপার। নাটকে খরগোশ সেজেছিল বুমবুম। সাদা পোশাক পরে, লম্বা লম্বা কান লাগিয়ে সে বেজায় লম্ফঝম্ফ জুড়ল মঞ্চ জুড়ে। ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে মিতিন তো হেসে বাঁচে না।

মা-ছেলে বাড়ি ফিরল রাত ন'টায়। ঢুকতে না ঢুকতে পার্থর সরল ঘোষণা,—তোমার লাবণ্য কেসের ড্রপসিন তো পড়ে গেল গো।

মিতিন থমকে গেল,—মানে?

—ক্যাচ কট কট। পুলিশ আসামি পাকড়াও করে ফেলেছে।

—কে আসামি?

—জামাই বাবাজীবন। রণজয় চৌধুরী। তুমি যাকে অ্যাপোলো বলেছিলে, সেই হারামজাদা। পার্থ চোখ নাচাল,—এই তো এতক্ষণ খবরে দেখাচ্ছিল। হুইস্কির গ্লাসে লাবণ্য ছাড়া যে দ্বিতীয় হাতের ছাপটি পাওয়া গেছে, সেটি শ্রীমান রণজয়েরই।

—তাই নাকি?

—শুধু তাই নয়, আরও অনেক কেলো বেরিয়েছে। মিস্টার অ্যাপোলো নাকি একটি আস্ত ক্যাসানোভা। বিয়ের আগে থেকেই শাশুড়ির সঙ্গে তার আশনাই ছিল। মেয়েকে বিয়ে করেও মোহব্বতে ছেদ পড়েনি। একই সঙ্গে দু'দিকে ডিউটি করে যাচ্ছিল। এভরি ফ্রাইডে নাকি জোর রংরলিয়া চলত শাশুড়ি-জামাইয়ে। সারা দুপুর। তবে কথায় আছে না, জন-জামাই-ভাগ্না কেউ নয় আপনা...! পার্থ হ্যা হ্যা হাসল,—ব্যাটা দিয়েছে শাশুড়িকে মোক্ষম দাওয়াই।

মিতিনের একটুও হাসি পেল না। গোমড়া মুখে বলল,—তা শাশুড়ি-জামাইয়ের রিলেশানের গল্পটা কীভাবে পিকচারে এলো?

—কাজের মেয়েটা বলেছে। রণজয়ও কনফেস করেছে।

—খুনটাও?

—সেটা অবশ্য টিভিতে বলল না। তবে স্বীকার তো করতেই হবে। পুলিশের গুঁতো যখন পড়বে পিঠে...।

—বাপ-মেয়ের কী রিঅ্যাকশান? তাদের দেখাল খবরে?

—মুহ্যমান মুখে বসে আছে দু'জন। স্পিক্‌টি নট্‌।...ফ্যামিলিতে এমন একখানা রগরগে স্ক্যান্ডাল, ঠোঁটে আর বাক্যি ফোটে!

পার্থকে বেশ পুলকিত দেখাচ্ছে। ধীর পায়ে ঘরে এল মিতিন। সালোয়ার-কুর্তা বদলে নাইটি চড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর বাথরুম-টাথরুম ঘুরে ফের এসেছে সোফায়। আরতি চা রেখে গেল, চুমুক দিচ্ছে কাপে, নিশ্চুপ মুখে।

পার্থ টেরিয়ে টেরিয়ে মিতিনকে দেখছিল। নাক কুঁচকে বলল, —টিকটিকি ম্যাডাম হঠাৎ গুম? আপসেট?

মিতিনের ঠোঁট নড়ল,—একটু।

—রণজয় অ্যারেস্ট হল বলে? পার্থ খিকখিক হাসছে,—নাকি তোমার আগে পুলিশ কেসটা সল্‌ভ করে ফেলল, সেই শোকে?

—দুটোর কোনওটাই না। আমার ধারণা, কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।

—হাসিও না তো। হুইস্কিতে আর্সেনিক, গ্লাসে হাতের ছাপ, চারটে অব্দি লাবণ্যর ফ্ল্যাটে রণজয়ের প্রেজেন্স, তাদের অবৈধ সম্পর্ক...আর কী চাই?

—কিন্তু মোটিভ?

—লাবণ্য নিশ্চয়ই আশনাইটা আর টানতে চাইছিল না। জামাই তাই রাগে...

—টেঁকে না। লাবণ্যর প্রেমে গদগদ থাকলে রণজয় মোটেই রুমকিকে বিয়ে করত না। হি হ্যাড লং টার্ম ইনটেনশান। শ্বশুরের সম্পত্তি।

—সেদিক দিয়েও ভাবা যায়। রণজয়ই হয়তো নোংরা রিলেশানটা থেকে ছাড়ান পেতে চাইছিল, আধবুড়িটা রাজি হচ্ছিল না। হয়তো সে জামাইকে ভয় দেখিয়েছিল, মেয়ের কাছে রণজয়ের আসলি চেহারা ফাঁস করে দেবে। ওই খ্যাপা মহিলার পক্ষে যা আদৌ অসম্ভব নয়। আর জানাজানি হওয়া মানেই তো সর্বনাশ। এমারেল্ড টাওয়ারের দু'খানা ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে যাবতীয় অ্যাসেট মরীচিকার মতো ভ্যানিশ। অগত্যা মরিয়া হয়ে এই কুকীর্তি।

—এটা তাও মন্দ শোনাচ্ছে না। স্লো-পয়জনিংয়ের কমপ্লেনটাও এর সঙ্গে অনেকটা মেলানো যায়। মিতিন ঘাড় নাড়ল,—তবু...এমন একটা বোকামি... আর্সেনিক মেশানো হুইস্কিটা ওভাবে ফেলে রেখে গেল? গ্লাস ধুয়ে জায়গা মতন রেখে দিলে তো সুইসাইড ছাড়া কিছু ভাবাই যেত না।

—এই সিলি ভুলগুলো করে বলেই না ক্রিমিনালরা ধরা পড়ে। পার্থ গলা ফাটিয়ে হাসল,—আর তোমরা টিকটিকিরা তাদের ঘেঁটি পাকড়ে করেকম্মে খাও।

—যা খুশি বলতে পারো, আমি কিন্তু কন্‌ভিন্সড নই। মিতিন টেবিলে কাপ নামাল,—এখনও বেশ কয়েকটা ফাঁক আছে। দু-একটা কো-ইন্সিডেন্সও ভারি অদ্ভুত।

—যেমন? পার্থ ভুরু কুঁচকোল,—তুমি কি এখনও লাবণ্য দেবীর হাজব্যান্ডকেই ধরে বসে আছ?

—আমি কাউকেই ধরে নেই। আবার কাউকে ছাড়ছিও না।

—বুঝেছি। পার্থ চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—এমন অবশ্য হতেই পারে লোকটা জামাইকে ফাঁসিয়ে নিজে পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেল। অনিমেষবাবু যেন কখন আবার এসেছিল এমারেল্ড টাওয়ারে?

—অ্যাকর্ডিং টু হিজ লাস্ট স্টেটমেন্ট, অ্যারাউন্ড পৌনে চারটে। দশ বিশ মিনিট এদিক-ওদিকও হতে পারে। সিকিউরিটির লোক সঠিক টাইম বলতে পারছে না।

—তাহলে সন্দেহ তো থাকেই। অফিস গিয়েও সে আবার ফিরেছিল কেন? বলেছে খুব টায়ার্ড ছিল, অথচ নিজের ফ্ল্যাটে না ঢুকে গাড়ি রেখে পার্কে গিয়ে বসে রইল?

—গ্লাসে কিন্তু তো তার হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি।

—রাইট। এইখানেই তো কেসটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

—কেন মিছিমিছি মগজকে ট্যাক্স করছ? ছাড়ো না। বলেই মিতিন ঠোঁট কামড়ে দু-এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন, তারপর মোবাইলে চেনা নম্বর টিপছে।

—আরে, ম্যাডাম যে? ও-প্রান্তে সুবীরের স্বরে উল্লাস,—দেখেছেন তো নিউজ, চিড়িয়াকে খাঁচায় পুরেছি।

মিতিন গলা মোলায়েম করে বলল,—কাজটা ঠিক হল কি? পরে পস্তাতে হবে না তো?

—কেন, কেন, কেন?

—কী বিষে লাবণ্য দেবীর মৃত্যু হয়েছে তা কিন্তু এখনও আন্‌নোন। আর্সেনিকে মুখ দিয়ে ওরকম গ্যাঁজলা বেরোয় না।

—রাখুন তো আপনার থিয়োরি। হুইস্কির সঙ্গে পান্‌চ করে পেটে কী রিঅ্যাকশান করেছে তার কি কোনও ঠিক আছে?

—তবু...ভিসেরা রিপোর্ট অব্দি ওয়েট করলে হত না?

—আহা, চার্জশিট তো তার পরেই ফ্রেম করব। নিশ্চিন্ত থাকুন, ভিসেরা আমাকে ডোবাবে না।

ফোনটা নামিয়ে রাখল মিতিন। কপালে মোটা ভাঁজ।

ডুবতে কিন্তু হলই সুবীর হালদারকে। পুরোটা না হলেও, অনেকটাই।

পুজোয় কুলু-মানালি বেড়াতে গিয়েছিল মিতিনরা, ফিরল দেওয়ালির মুখে মুখে। হপ্তাখানেক পরেই এক সন্ধেবেলা সুবীরের উদ্বিগ্ন ফোন, —ম্যাডাম কি বাড়িতে আছেন?

—আছি। কেন?

—আমি আসছি। জরুরি দরকার।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ। হন্তদন্ত পায়ে সুবীরের প্রবেশ। ধপাস করে সোফায় বসে বলল,—আপনার প্রেডিকশানই ফলে গেল।

মিতিন মুচকি হাসল,—লাবণ্য মজুমদারের ভিসেরা রিপোর্ট এসেছে বুঝি?

—আজই পেলাম। মহিলার লিভার-কিডনিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে বটে, তবে তা নিতান্ত সামান্য। লিথাল ডোজ একেবারেই নয়।

—তাহলে পয়জনিংটা...?

—স্ট্রেঞ্জ কেস ম্যাডাম। দু'ধরনের ওষুধের জয়েন্ট এফেক্ট।

—ওষুধ? কী ওষুধ?

—নামগুলো হল...। বুকপকেট থেকে একখানা চিরকুট বার করল সুবীর। চোখ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ধরে বিনা চশমায় পড়ছে, —মনো-অ্যামিনো অক্সিবেস্‌ড ইনহিবিটার্‌স। আর অ্যামিট্রিপ্‌টিলিন্‌...

—এগুলো তো মেন্টাল ডিপ্রেশানের মেডিসিন! রিভার্স গ্রুপ! হাইলি রিঅ্যাক্টিভি! মিতিন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, দুটো একসঙ্গে পড়লে ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে যে কেউ মারা যাবে।

—তাই বুঝি? সুবীর মাথা চুলকোচ্ছে,—তাহলে তো এটা সুইসাইডের কেসও হতে পারে। কিংবা মহিলা ভুল করে একসঙ্গে দুটো মেডিসিন...

—কিন্তু দুটো একসঙ্গে থাকবে কেন?

—কারেক্ট। সুবীর খাড়া হয়ে বসল,—এই লাইনেও তো রণজয় চৌধুরীকে বাঁধা যেতে পারে। ব্যাটা নির্ঘাত আর্সেনিক মেশানো মদ গেলাতে না পেরে বাই ফোর্স ওই দুটো ওষুধ খাইয়ে...

—কেস গুছিয়ে সাজাতে পারবেন তো?

—খুব পারব। ওই ধিনিকেষ্টকে আমি ছাড়বই না। ভালমানুষ বাবা আর নিরীহ মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিয়েছে...সাজা বাছাধনকে পেতেই হবে।

—রণজয় কি এখনও জেল কাস্টডিতে?

—বেরনোর জন্য হাঁকপাঁক করছে। ওর বাপ দাদারা হাইকোর্ট অব্দি বেল পিটিশান মুভ করেছিল, খারিজ হয়ে গেছে।

—রণজয়কে জেরা করে কিছু বের করা গেল?

—রিলেশানটা অ্যাডমিট করছে, কিন্তু মার্ডার চার্জটা মানছে না। এনি ওয়ে, তুলি তো কোর্টে, তারপর দেখা যাবে।

ঢকঢক দু'গ্লাস জল খেয়ে চলে গেল সুবীর। মিতিন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যালকনিতে। মিনিট দশেক পর ফিরল ঘরে। পায়চারি করছে আপনমনে। হঠাৎই কী ভেবে নিজের স্টাডিরুমে এসে কাগজ কলম নিয়ে বসল। লিখছে, আঁকিবুঁকি কাটছে...। মোবাইল তুলে আচমকা ডায়াল করল অনিমেষ মজুমদারকে। জেনে নিল ডক্টর সেনগুপ্তের নাম্বার। ফের মোবাইলের বোতামে আঙুল। হ্যাঁ, পেল লাবণ্যর ডাক্তারকে। কথা সেরে অফ করে দিল ফোন। মাথা রাখল টেবিলে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে মিতিন। বসেই আছে।

বাসস্টপ থেকে রুমকিকে দেখতে পেল মিতিন। স্কুলগেট পেরিয়ে এগিয়ে আসছে মন্থর পায়ে। জীবন্ত এক বিষাদপ্রতিমা যেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলকল করছে চারপাশে, কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই রুমকির। এমনই উদাস, এমনই সন্তপ্ত।

কাছে গিয়ে মিতিন মৃদু স্বরে ডাকল,—রুমকি?

চমকেছে মেয়েটা। অবাক মুখে বলল,—আপনি? এখানে?

—আপনার কাছেই...। স্কুল ছুটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

—দরকার আছে কোনও?

—হুঁ।... এমারেল্ড টাওয়ার তো কাছেই, চলুন না এগোতে এগোতে কথা বলি।

পড়ন্ত বেলা। হেমন্তের পেলব রোদ্দুর মায়া বিছিয়েছে পথে। টুপটাপ ঝরছে শুকনো পাতা। বাতাসে হাল্‌কা শিরশিরে ভাব।

হাঁটতে হাঁটতে মিতিন নিচু গলায় বলল,—আপনাকে একটা গল্প শোনাব বলে এসেছি। এক দুঃখী মেয়ের কাহিনি।

রুমকি ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল,—হঠাৎ?

—এমনিই। ইচ্ছে করছে। গল্পটা বোধহয় আপনার চেনা চেনা লাগবে। বুনতে গিয়ে যদি কোথাও ফাঁকফোকর আসে, আপনি শুধরেও দিতে পারেন। আড়চোখে রুমকিকে দেখে নিয়ে মিতিন শুরু করল,—নেহাতই মধ্যবিত্ত এক তরুণীর বিয়ে হয়েছিল এক ব্রাইট কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। স্রেফ রূপের জোরে। বিয়ের বছর দেড় দুই পর তাদের একটি মেয়ে হল। তারপর থেকেই মহিলা যেন কেমন বদলে যেতে থাকল। তার বর সাফল্যের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে, রোজগার করছে এন্তার, বউকে স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের উপকরণ কিনে দিচ্ছে রাশি রাশি, কিন্তু বউয়ের জন্য খরচ করার সময় তার নেই। স্বামীর সাহচর্য না পেয়ে পেয়ে, এক চোরা বুভুক্ষা থেকে, মহিলার মধ্যে জন্ম নিল এক অদ্ভুত বিকৃতি। স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবন আর তার পছন্দ নয়, তার চাই নিত্যনতুন উত্তেজনা। চাই নেশা, চাই উদ্দামতা। ক্লাব। পার্টি। পুরুষমানুষ। একটু একটু করে সে চলে গেল স্বামীর হাতের বাইরে। নিজের মেয়ের দিকেও সে আর ফিরে তাকায়নি। মা নয়, সেই মেয়েটাকে নিয়েই আমার গল্প।

—কী গল্প?

—বলছি তো।...মেয়েটা এদিকে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। তার একদিকে কাজপাগল বাবা, অন্য দিকে তুমুল উচ্ছৃংখল মা। দু'জনের মাঝখানে পড়ে সে একা, ভীষণ একা। শামুকের মতো একটা খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও মিশতে পারে না। কলেজ-টলেজ পাশ করে মেয়েটা মোটামুটি একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলল, ডুবে থাকতে চাইল অন্য দুনিয়ায়। এমনই এক সময়ে মেয়েটির জীবনে এল এক অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ। তার মা'ই পরিচয় করিয়ে দিল ছেলেটার সঙ্গে। নেহাতই সাদামাটা চেহারার অন্তর্মুখী মেয়েটা স্বপ্নেও ভাবেনি এমন একটি রূপবান পুরুষ আসবে তার জীবনে। ছেলেটা তার প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখাতেই সে পাগলের মতো ভালবেসে ফেলল তাকে, আর বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে তো আত্মহারা। বেচারা তখন ঘুণাক্ষরে টের পায়নি, গোটা ঘটনাটাই একটা সাজানো ছক। তার মা চেয়েছিল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে পুরোপুরি কব্জায় রাখতে। আর ছেলেটার টার্গেট ছিল তার সোকল্ড শ্বশুরের সম্পত্তি।

যাই হোক, বিয়ের পর দিব্যি চলছিল শাশুড়ি-জামাইয়ের লীলাখেলা। তবে বাইরে বাইরে। নতুন একটি মেয়ে কাজে লাগার পর বাড়িতেই শুরু হয়ে গেল ফুর্তি। কাজের মেয়েটা সপ্তাহে একদিন দুপুরে বেরিয়ে যায়, ঠিক

সেই সময়টায়। কিন্তু কপাল খারাপ। কাজের মেয়েটা একদিন কী কারণে যেন বেরিয়েও ফিরে এল, গোপনে দেখে ফেলল সমস্ত কীর্তিকলাপ। ব্যস্ খবর পৌঁছে গেল মেয়ের কানে। অমনি আগুন জ্বলে উঠল তার বুকে। প্রতিহিংসার। ঘেন্না তো মাকে সে করতই, এবার স্থির করল একেবারে শেষ করে দেবে। শুরু হল পরিকল্পনা মাফিক আর্সেনিক পয়জনিং। কেমিস্ট্রির ছাত্রী সে, জানে চায়ের সঙ্গে কতটুকু করে মেশালে মা ধিকিধিকি মরবে, কিন্তু কাকপক্ষীটিও টের পাবে না।

তা সেই মতোই চলছিল। তবে বিধি বাম। আচমকা এক বই পড়ে মার মনে ধন্দ জাগল। সেঁকো বিষের লক্ষণ কেন ফুটে উঠছে দেহে? মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্বামী যে নতুন করে তাদের সম্পর্কটা গড়ে তুলতে চাইছে, এটা মা বুঝলই না, উল্টে স্বামীর সহৃদয় ব্যবহার তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। মানসিক রোগী বলে ডাক্তারও যখন তাকে তেমন আমল দিল না, সে ছুটল ডিটেকটিভের কাছে। ডিটেকটিভ মাকে রক্ত পরীক্ষা করাতে বলেছে জেনেই মেয়ে প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ, এবার তো চক্রান্ত ধরা পড়ে যাবে!

আর সময় নষ্ট করল না মেয়ে। প্ল্যানমাফিক শুক্রবার স্কুল যাওয়ার আগে মার কাছ থেকে প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরির রসিদটা চেয়ে নিল, রিপোর্টটা সে নিজেই আনবে। দুপুরে জানল, বাবা হঠাৎ ফিরে এসেছে। বাবার অবর্তমানেই কাজটা শেষ করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু তখন আর পিছনোর উপায় নেই। স্লো-পয়জনিংয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে যে। অতএব পুরনো পরিকল্পনা মতোই চারটে বাজার মিনিট কয়েক আগে ফোন করল নিজের ফ্ল্যাটে, বর তখন আটতলায়, ধরল না। সঙ্গে সঙ্গে বরকে মোবাইলে ফোন। বলল, লোক আসবে, তাকে বসাও। বর তড়িঘড়ি নেমে এল নীচে। ফ্ল্যাটে সে ফিরল কিনা বুঝে নিতে ফের নীচের ল্যান্ডলাইনে ফোন। হ্যাঁ, কাঁটা সরে গেছে, ময়দান ফাঁকা। এবার মেয়ে সোজা গেল মায়ের ফ্ল্যাটে। জামাইয়ের সঙ্গে ব্যভিচার নিয়ে সরাসরি মাকে চার্জ করল। ওমনি হিস্টিরিক হয়ে পড়ল মা। তাকে শান্ত করার জন্য মেয়ে পলকে নরম, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দুটো ওষুধ খেতে দিল। মার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুবাদে সে জানত মানসিক অবসাদের ওই দুটো ওষুধ একসঙ্গে খেলে এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে মা মরবেই। তবু অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ। যতক্ষণ না মার কন্‌ভালশান থামে। তারপর ঠান্ডা মাথায় সিংকে নামানো দুটো গ্লাসের একটাকে রুমালে জড়িয়ে তুলে এনে, তাতে

ফের হুইস্কি ঢেলে, দুশো মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক মিশিয়ে রাখল সকলের দৃষ্টির সামনে। নিঃশব্দে নিজের ফ্ল্যাটে এসে ইনশিওরেন্সের এজেন্টের সঙ্গে কথা বলল, চাউমিন বানাল...। সে অবশ্য জানতে পারেনি, তার বাবাও সেদিন ফিরেছিল ফ্ল্যাটে। খানিক আগেই। বউ আর জামাইকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার বাসনা নিয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করতেই সে চলে গেছিল, ফোন পাওয়ার সময়ে পার্কে বসে ভাবছিল কী করবে সে এখন। হয়তো খুনই করে ফেলত সে, কিন্তু স্ত্রীকে সত্যিকারের ভালবাসে বলেই কাজটা সে পেরে ওঠেনি, নতমস্তকে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল। শ্বশুর যে হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরেছে, এটা জামাই জানত বলেই সে শাশুড়ির মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে প্রথমেই তাকে ফোন করেছিল। শাশুড়ির ফ্ল্যাটে সেদিন দুপুরে না গেলে খবরটা তো তার জানার কথাই নয়। যাই হোক, এখন অবশ্য বাবা মেয়ে দু'জনেরই হাড় জুড়িয়েছে। মহিলাও খতম, জামাইও শ্রীঘরে।

একটানা বলে থামল মিতিন। দেখছে রুমকির প্রতিক্রিয়া। অনেকক্ষণ পর রুমকির স্বর ফুটল,—মেয়েটার এখন কী করা উচিত?

—সেটা মেয়েটাই ঠিক করুক। রুমকির কাঁধে হাত রাখল মিতিন। আলতো হেসে বলল,—তবে একটা ব্যাপার মেয়েটার বোঝা দরকার। তার মা'ও কম দুঃখী ছিল না। যৌবনে স্বামীসঙ্গ না পেয়েই সে এই ধরনের বিকৃতির মধ্যে ডুবে গেছিল। সে ছিল সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্যহীন, নেশাগ্রস্ত এক বিপথগামী নারী। তাকে হত্যা করাটাকে মেয়েটার বিবেক সায় দেবে কি না, নাকি মেয়েটাকে সারাজীবন দগ্ধে দগ্ধে মারবে তা আমি কী করে বলব রুমকি? এটুকু বলতে পারি, নিজে সারেন্ডার না করলে মেয়েটাকে কোনও দিনই ধরা যাবে না।

নিঝুম হয়ে শুনল রুমকি। নিঃশব্দে অতিক্রম করল বাকি পথটুকু। এমারেল্ড টাওয়ারের গেটে পৌঁছে নির্জীব চোখে একবার দেখল মিতিনকে। তারপর চলে গেল পায়ে পায়ে।

পরদিন সকালে সুবীর হালদারের ফোন পেল মিতিন। এমারেল্ড টাওয়ারে আবার অস্বাভাবিক মৃত্যু। এবার আটতলা নয়, তিনতলায়।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে রুমকি।

তৃষ্ণা মারা গেছে

স্নান সেরে ফের কম্পিউটারে বসেছিল পার্থ। তাস খেলছে। ইদানীং এই এক নতুন নেশা হয়েছে তার। একটু ফাঁক পেল তো ওমনি কম্পিউটারে ব্রিজ। ছুটির দিন তো কথাই নেই, মনিটারের সামনে থেকে তাকে ঠেলে তোলা কঠিন। কাল্পনিক এক পার্টনার নিয়ে যন্ত্রগণকের জুটিয়ে দেওয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চলে চোয়াল-কষা লড়াই। মাউস্ টিপে কল দিচ্ছে, থ্রি স্পেডস্, ফাইভ হার্টস্, সিক্স নো-ট্রাম্প্। কখনও নিজের চালে সে নিজেই বিমোহিত, আবার কখনও বা ভুরু-টুরু কুঁচকে বসে আছে ঘাড় ঝুলিয়ে।

অলীক যুদ্ধটা বেশ চুলছিল আজ। পর পর দুটো স্লাম খেলল পার্থ, তার মধ্যে একটা জি-এস। রাবার হওয়ার খুশিতে গান গাইছে গুনগুন। দে মা আমায় তবিলদারি...

তৃতীয় বার তাশ বাঁটতেই বিঘ্ন। পিছনে মিতিন,—কী ব্যাপার, খাওয়া-দাওয়া হবে না?

পার্থর ভ্রুক্ষেপ নেই,—তাড়া কীসের মহারানি? আজ তো রোববারের বাজার!

—রোববার কি রাজামশাইয়ের খিদে পায় না? ক'টা বাজে খেয়াল আছে?

—ক'টা?

—একটা পঁচিশ। আরতি ভাত বেড়ে দিয়েছে।

—দু'মিনিট। দানটা শেষ করে নিই। বলেই পার্থ হায় হায় করে উঠেছে, —যাচ্চলে! আমার কিং-টা ধরা পড়ে গেল।

মিতিন ঝলক চোখ চালিয়ে দেখল বোর্ডের অবস্থাটা। ফিক করে হেসে বলল,—স্পেডের কিং তো মার যাবেই। ভুল হাতে ফিনেস্ নিয়েছ যে।

—কেন? ভুল কেন?

—বারে, ইস্ট গোড়াতেই টু ডায়মন্ড দিয়ে কল ওপেন করেছে, তার পয়েন্ট ক্যালকুলেট করবে না? মিনিমাম এইটিন? বোঝাই তো যায় ও হাতে স্পেডের এস্‌টা আছে।

—হুম, গণ্ডগোল হয়ে গেল। পার্থ ঈষৎ বেজার,—নির্ঘাত দুটো শর্ট খাব।

—শোকটা ভুলতে চাইলে চলে এসো চটপট। ভাত কিন্তু এবার জুড়িয়ে যাবে।

গেম শেষ করে উঠল পার্থ। ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভেঙে পায়ে পায়ে ডাইনিং টেবিলে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে একবার দৃষ্টি বোলালো ছড়ানো-ছেটানো বাটি-ডেক্‌চিগুলোর দিকে। উল্লসিত স্বরে বলল,—ওয়াও, এ তো গ্র্যান্ড মেনু!

মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন আজ সত্যিই লোভনীয়। কড়াইশুঁটি সহযোগে সোনামুগের ডাল, পোস্তর বড়া, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি, তেলকই, জলপাইয়ের চাটনি এবং ঘরে পাতা টকদই। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে কর্তা গিন্নি কারোরই গুছিয়ে খাওয়ার সময় থাকে না। পার্থ নাকেমুখে গুঁজে দৌড়োয় তার বউবাজারের প্রেসে, আর মিতিন তো ব্যস্ত তার কেস নিয়ে। রবিবার একত্রে আহারে বসে, তাই রান্নাও সেদিন একটু স্পেশাল। আরতিকে সরিয়ে মিতিন নিজেই খুন্তি ধরে মাঝেসাঝে, বানায় টুকটাক।

হাসি হাসি মুখে মিতিন বলল,—আগে একটু তেলকইটা টেস্ট করে দ্যাখো তো। নুনটা মনে হয় একটু বেশি পড়ে গেছে।

কালচে লাল গ্রেভি আঙুলে চেটে বিচিত্র মুখভঙ্গি করল পার্থ। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে খেলিয়ে খেলিয়ে বলল,—যদি আর এক চিলতে নুন কম দিতে...

—ঠিকঠাক হত, তাই না?

—উঁহু, নুন কম লাগত। পার্থ একগাল হাসল,—দিস ইজ হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট। ঝালটাও যা দিয়েছ না...আহা-হা। ধন্য। ধন্য।

—কাকে ধন্য ধন্য করছ? আমাকে?

—না ম্যাডাম, কইমাছগুলোকে। কোন পুণ্য বলে যে তোমার হাতে এসে পড়েছিল!

—থাক, আর বেশি মস্‌কা মেরো না।

পার্থ খাওয়া শুরু করেছে। ডাল মাখতে মাখতে জিজ্ঞেস করল, —বুমবুমের খ্যাটন কম্‌প্লিট?

—অনেকক্ষণ। সে তো ডাল মাছ কিছু ছোঁবে না, ওবেলার চিকেন কষা দিয়েই...

—আজকালকার বাচ্চারা চিকেন কেন এত ভালবাসে বলো তো? তাও দিশি হলে কথা ছিল, ব্রয়লার তো কেমন ঘাস ঘাস লাগে।

—কী আর করা, যে যুগের যা টেস্ট। ওদের জিভটাই বদলে গেছে। মিতিন পোস্তর বড়ায় কামড় দিল,—যেমন ধরো গান। মেলোডি এখন অবসোলিট, এখন চলছে বিটের যুগ। ক্লাসিকাল নাচ তো প্রায় ভ্যানিশই করে যাচ্ছে, তার জায়গায় এসেছে ঝাঁকি নৃত্য। সেটা না জিমন্যাস্টিক, না ওয়েস্টার্ন, না ইস্টার্ন...। বলতে পারো, একটা বিটকেল হাঁসজারু।

—আসলে ব্যাপারটা কী জানো? চটজলদির বাজার তো এখন...কোনও কিছু ধৈর্য ধরে শিখবে, জানবে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে, তার আর কোনও সময় নেই। এখন হচ্ছে ধর তক্তা মার পেরেক। নাচ গান আমোদ-আহ্লাদ, সব কিছুতেই চাই হরবখ্ত উত্তেজনা।

—কারণও আছে। এখনকার ছেলেমেয়েদের লাইফ্টা যা টেনশান-প্যাক্ড। সারাক্ষণ তো শুধু কম্পিটিশান। চিন্তা করে দ্যাখো, একুশ বাইশ বছর আগে যখন হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিলাম, তখন কিন্তু এতটা র‍্যাটরেস ছিল না।

—সত্যি টেনশানই ছেলেমেয়েগুলোকে পিষে ফেলছে। এত চাপ, এত চাপ...। পার্থ মাছের মাথা চুষতে চুষতে বলল,—এই জন্যই তো বলি, বুমবুমকে পড়াশুনো নিয়ে বেশি প্রেশার দিও না। বেচারাকে নিজের মতো করে বড় হতে দাও।

—নিজের মতো? না তোমার মতো? মিতিন চোখ টিপল,—ঘুম থেকে উঠে আয়েশ করে বিছানায় গড়াগড়ি খাবে, তারপর হেলেদুলে বাজার, গজেন্দ্রগমনে কাজে বেরনো...

—ওটাই তো হ্যাপিনেস ম্যাডাম। অযথা টেনশান দিয়ে মগজকে ব্যতিব্যস্ত করব কেন? সেই কবিতাটা মনে আছে? এ পুওর লাইফ দিস ইফ ফুল অফ কেয়ার, উই হ্যাভ নো টাইম টু...

সময় না থাকায় লাইন দুটো শেষ করার সময় পেল না পার্থ। মোবাইল ডাকছে। পুরনো এক বাংলা গানের সুরে।

বিরস মুখে উঠে গিয়ে সোফায় পড়ে থাকা সেলফোনটা তুলল পার্থ। মনিটারে নাম দেখেই স্বরে আলগা কৌতূহল,—কী রে তমাল, তুই এখন? হঠাৎ?

—ভীষণ বিপদে পড়েছি রে। ওপারে তমাল রীতিমতো ত্রস্ত।

—তোর তো সর্বক্ষণই বিপদ। পার্থ হ্যা হ্যা হাসল,—আজ আবার কী হল?

—আমার রাজডাঙার ফ্ল্যাটটায়...সর্বনাশ হয়ে গেছে। এখন যে কী হবে!

—আরে, হয়েছেটা কী বলবি তো? চুরি? ডাকাতি? গুণ্ডা-বদমাইশের উৎপাত?

—তার চেয়েও বেশি। খারাপ, খুব খারাপ। তমালের গলা কাঁদো কাঁদো, —দুটো মেয়েকে ওখানে পেয়িং গেস্ট রেখেছিলাম না...তাদের একজন সুইসাইড করেছে।

পার্থ ক্ষণিক থমকাল। তবে গোয়েন্দা বউয়ের সঙ্গদোষে এই সব সমাচারে তার তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না। গলা ঝেড়ে বলল,—অ। তো?

—তো মানে? পুলিশ এবার আমার ঘাড়ে চাপবে না?

—সে তো চাপবেই।

—আমি ফ্যাসাদে পড়লাম না?

—তা তো পড়লিই। এটাই তোর উপযুক্ত শাস্তি। তোকে পইপই করে বলেছিলাম, ফ্ল্যাটটা ফাঁকাই রেখে দে। মাঝেমাঝে আমরা বন্ধুরা গিয়ে আসর জমাব। তখন তো কথা কানে নিলি না। ক'টা টাকার লোভে উটকোপাটকা মেয়েদের...

—কাটা ঘায়ে আর নুন ছেটাস না পার্থ। তোর গিন্নিকে দে। আছে তো বাড়িতে?

—কেন? সে কী করবে?

—আহ্, দে না লাইনটা। একটু কথা বলি।

খাবার টেবিলে ফিরে মোবাইলটা মিতিনকে বাড়িয়ে দিল পার্থ। রিসিভারে হাত চেপে বলল, —কেলো কেস। তমালের রাজডাঙার ফ্ল্যাটে একটা মেয়ে পেয়িং গেস্ট সুইসাইড করেছে।

—ও। মিতিন সেলফোনটা কানে চাপল,—হ্যাঁ তমালদা, বলুন। কখন ঘটল ঘটনাটা? কখন?

—বোধহয় কাল রাত্তিরে। কিংবা আজ সকালে। আমি ডিটেল জানি না ভাই। এইমাত্র সুকন্যা...মানে অন্য মেয়েটি আমায় ফোনে জানাল।

—কীভাবে মারা গেল?

—রিভলবারের গুলিতে।

—বলেন কী? মেয়েটির কাছে রিভলবার ছিল?

—জানি না রে ভাই। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

—সুকন্যা বলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন না?

—না মানে...শুনে এমন নার্ভাস হয়ে গেলাম...। সুকন্যা এক্ষুনি যেতে ডাকছে। যাব?

—অবশ্যই।

—বলছ? তমালের গলা কাঁপছে,—কিন্তু পুলিশও আসছে যে।

—আসুক। আপনার ভয়ের কী আছে! মেয়েটির সম্পর্কে যা যা জানেন, বলে দেবেন।

—কিন্তু...পুলিশে ছুঁলে তো ছত্রিশ ঘা। তমাল আচমকাই অনুনয় জুড়ল, —তুমি আমার সঙ্গে একটু যাবে, প্লিজ?

—গিয়ে?

—তোমার তো পুলিশের সঙ্গেই ওঠাবসা...একটু গার্ড টার্ড করবে আর কী। বলা যায় না, হয়তো ফস করে আমায় অ্যারেস্ট করে ফেলল। আফটার অল ফ্ল্যাটটা তো আমারই। তমালের স্বরে ফের মিনতি,—প্লিজ, চলো না সঙ্গে।

মিতিন ভাবল দু-এক সেকেন্ড। বুঝি বা ঈষৎ আগ্রহও জেগেছে। বলল, —ও-কে। যাব।

—আমি এক্ষুনি তোমায় তুলে নিচ্ছি। উইদিন টোয়েন্টি মিনিটস্।

সেলফোন অফ করতেই পার্থ হাঁ হাঁ করে উঠেছে,—তুমি এখন সত্যি সত্যি রাজডাঙা ছুটবে নাকি?

—সার্টেনলি। মিতিন চটপট খাওয়া শেষ করায় মন দিল,—তমালদা বিপন্ন বোধ করছে...

—ছাড়ো তো। তমালটা বহুৎ ডরপুক, অলওয়েজ কাঁপছে। এল-আই-সি প্রিমিয়াম জমা পড়েনি...ওমনি হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। ট্যাক্সের বিল দিতে ভুলে গেছে, আতঙ্কে দাঁতকপাটি। ইলেকট্রিক বিলের লাস্ট ডেট পার হয়ে গেলেও ও যা সিন করে...

—ভুল করছ পার্থ। এই প্রবলেমটা কিন্তু ওরকম সিলি নয়। এটা মৃত্যু। সুইসাইড। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফরমেশান, রিভলবারের গুলিতে। যেটা হাইলি আন-ইউজুয়াল। তমালদা যেহেতু পার্মানেন্ট ভাড়াটে না বসিয়ে জাস্ট পেয়িং গেস্ট রেখেছে, ওই ফ্ল্যাটে যা ঘটবে তার দায়দায়িত্ব তমালদারই।

এতক্ষণে পার্থ যেন খানিকটা সিরিয়াস হয়েছে। সম্ভবত রিভলবারের কথাটা শুনে। একটু থেমে থেকে বলল,—কিন্তু তুমি সেখানে গিয়ে...

—তুমি নয়। তোমরা।

—মানে?

—প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। খেয়ে-দেয়ে আবার তাসে বসবে, কিংবা লেপ মুড়ি দেবে...ওটি হচ্ছে না। প্যান্টশার্ট গলিয়ে আমার সঙ্গে বেরোবে এখন।

—লে হালুয়া, আমাকেও ফাঁসাচ্ছ?

—তোমার কপাল।

কোনওক্রমে গিলে তৈরি হতে না হতে তমাল হাজির। গাড়ি নিয়ে। বুমবুম ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে আরতির জিম্মায় রেখে বেরিয়ে এল মিতিন আর পার্থ।

শেষ পৌষের দুপুর। আকাশ ঝকঝক করছে। বড়দিনের সময় থেকেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা নেমেছিল, এখনও তার দাপট কম নয়। কড়ারোদ্দুরেও হাওয়াতে শীতের কামড় বেশ প্রকট। বাতাসটা বড্ড শুকনো, চামড়ায় টান ধরে।

নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে তমাল। দেখেই বোঝা যায় বেজায় ঘাবড়েছে বেচারা। তার পাশে মিতিন, পিছনে পার্থ। ঢাকুরিয়া কসবার গলিঘুঁজি পেরিয়ে বাইপাস কানেক্টারে পড়ল সাদা মারুতি। রাজডাঙার দিকে চলেছে। পেরল কসবা থানা।

আড়চোখে থানাটাকে দেখে নিয়ে মিতিন বলল,—হ্যাঁ তমালদা, এবার একটু ডিটেলে শোনা যাক। খবরটা পেলেন কখন?

—এই তো...অ্যারাউন্ড দেড়টা।

—আপনার তো দুটিই পেয়িং গেস্ট? ওই সুকন্যা, আর যে মেয়েটি...

—তৃষ্ণা। তৃষ্ণা মল্লিক। আমি দু'ঘরে দু'জনের বেশি রাখতে চাইনি। ইনফ্যাক্ট, পেয়িং গেস্ট রাখার প্ল্যানই ছিল না। ভেবেছিলাম কোম্পানী লিজে দেব। তেমন পার্টি পেলাম না...ফ্ল্যাটটা ফাঁকাই পড়ে, মেনটেনেন্সের পয়সা গুনতে হচ্ছে...তাই মোটামুটি ফার্নিশ করে দুটো মেয়েকে থাকতে দিলাম।

—ওরা কি আপনার পরিচিত?

—একেবারেই না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তার বেসিসে...

—করেছিস কী রে? রিভলবারওয়ালা অচেনা দুটো মেয়েকে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলি? পার্থ পিছন থেকে ফুট কাটল,—তোর কপালে দুঃখ আছে।

—ফের ভয় দেখাচ্ছিস্? তমাল জোর করে হাসার চেষ্টা করল,—আমি কি ছাই জানতাম রিভলবারের কথা! নরমাল সব ফরম্যালিটি আমি পালন করেছি। অজানা দুটো মেয়ের আইডেনটিটি ভেরিফিকেশন, অফিসে

খোঁজখবর নেওয়া, কী রকম স্যালারি পায় তার হদিশ করা...প্লাস, তাদের নেচার...এর বেশি আমার আর কী করার আছে?

—বটেই তো। মিতিন সায় দিল,—বাই দা বাই, তৃষ্ণা মেয়েটির নেচার কী রকম ছিল?

—বেশ ভাল। শান্ত, ভদ্র, শিক্ষিত, কথা কম বলে, গান-টান শোনার ঝোঁক ছিল...। তুলনায় সুকন্যা বরং একটু ত্যাড়া ত্যাড়া। কাঠ কাঠ।

—ওরা কদ্দিন আছে ওই ফ্ল্যাটে?

—তা প্রায় মাস দশ এগারো। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে এসেছে।

—একসঙ্গে? আই মিন, ওরা কি আগে থেকেই বন্ধু?

—অফিস কলিগ। প্রায় একই সঙ্গে কাজে ঢুকেছিল।

—কোন অফিস?

—ওই...আজকাল যার রমরমা। কল সেন্টার। সল্টলেকে অফিস। সেক্টর ফাইভে।

—নাম কী অফিসের?

—এক্স ফ্যাক্টর।

—মেয়েগুলো নিশ্চয়ই কলকাতার নয়?

—সুকন্যার বাড়ি আসানসোলে। বাবা কোল ইন্ডিয়ার অফিসার। আমার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। তবে তৃষ্ণার অ্যাজ সাচ কোনও ডেরা নেই। বাবা-মা মারা গেছে, বহরমপুরে মামার বাড়িতে থাকত, তাদের সঙ্গে সম্পর্কও খুব একটা মধুর নয়, যেতও না বড় একটা। বহরমপুর থেকেও কেউ দেখা করতে এসেছে বলে শুনিনি।

—আর কী জানেন তৃষ্ণার সম্পর্কে? প্রেম-ট্রেম করত?

—শিওর বলতে পারব না। তবে মনে হয় বয়ফ্রেন্ড ছিল। পাশের ফ্ল্যাটেই এক টকেটিভ মহিলা আছেন, তিনি আমায় দু-একদিন জানানোর চেষ্টাও করেছেন। আমি খুব একটা পাত্তা দিইনি। বাইপাস কানেক্টার ছেড়ে বাঁয়ে এক চওড়া রাস্তায় ঢুকেছে গাড়ি। পথটা সামান্য ভাঙাচোরা, পিচ ওঠা। সতর্কভাবে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে তমাল বলল,—তা চব্বিশ পঁচিশ বছরের ইয়াং মেয়ে, ছেলেবন্ধু তো তাদের থাকতেই পারে। তবে হ্যাঁ, স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশান দেওয়া ছিল, কোনও ছেলে ফ্ল্যাটে নাইট-স্টে করতে পারবে না। এবং কেউ কোনও দিন থাকেওনি।

—এটাও কি সেই ভদ্রমহিলার ইনফরমেশান?

—না। সুশীল...মানে ও বাড়ির কেয়ারটেকারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। অবশ্য থাকবেই বা কী করে? দুটো মেয়েই তো বিকেল সন্ধেয় বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই ভোরবেলায়।

—তোর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত মেয়ে দুটোর? পার্থ আচমকা প্রশ্ন ছুড়ল, —নাকি পুরো ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়েছিলি?

—না রে বাবা, না। সপ্তাহে একদিন আমি আসিই। সাধারণত শনিবার। ঘরদোর ঠিকমতো সাফসুফ হচ্ছে কি না দেখি। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় বদলানোর ব্যবস্থা করি।

—কাল তো শনিবার ছিল। গিয়েছিলি?

—সুকন্যা কাল ছিল না। আসানসোল গিয়েছিল। তৃষ্ণার সঙ্গে কথা হল... তখন অ্যারাউন্ড সাড়ে এগারোটা...। মেয়েটাকে দেখে তখনও কিছুই বোঝা যায়নি। একেবারেই স্বাভাবিক। রুটিন মাফিক বেলা করে ঘুম থেকে উঠে টিভি দেখছিল। আমাকে বলল, বাথরুমের গিজারটা নাকি গণ্ডগোল করছে, ঠিক মতো কাট-আউট হচ্ছে না...আমি বললাম, নো প্রবলেম। সুশীলকে বলে যাচ্ছি, মিস্ত্রি ডেকে দেখিয়ে দেবে...

মিতিন কান খাড়া করে শুনছিল কথাগুলো। দৃষ্টি বাইরে। নতুন এক জনপদ গড়ে উঠছে এদিকটায়, তবে এখনও বেশ ফাঁকা ফাঁকা। বড় একটা স্কুল হয়েছে, গজাচ্ছে দু-চারটে অফিস। রয়েছে প্রকাণ্ড এক খোলা মাঠ। শীতের বেলায় মনের আনন্দে সেখানে ক্রিকেট খেলছে জনাকয়েক কিশোর। মাঠের এপাশটায় সার সার আবাসন। নতুনের গন্ধ মাখা।

বাড়িগুলো দেখতে দেখতে মিতিন জিজ্ঞেস করল,—তারপর আপনি এখান থেকে গেলেন কখন?

—বেশিক্ষণ ছিলাম না। জোর আধ ঘণ্টাটাক। তৃষ্ণাও তো তখন আমার সঙ্গে বেরল। কসবার মুখটায় ওকে নামিয়ে দিলাম। কী সব যেন কাজ ছিল। তখনও শি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি নরম্যাল। ওই মেয়ে যে কী করে সুইসাইড করল...

—ওভাবে কিছু বলা যায় না, তমালদা। মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ,—কোন মানুষ যে কখন কী করে বসে, তার মনের ভেতর কী চলছে, বোঝা বড় কঠিন। অনেক সময়ে মুহূর্তের সিদ্ধান্তেও তো...

—তা ঠিক। আমি তো মেয়েটাকে ঠিক সেভাবে খেয়াল করিনি। জাস্ট ক্যাজুয়ালি...যেমন অন্যদিন দেখি...

তমালের কথা মাঝপথেই থেমে গেল। কমলা রঙের চারতলা ফ্ল্যাটবাড়িটি দেখা যাচ্ছে। গেটের সামনে মানুষের জটলা। দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ভ্যান। গেটেও পুলিশ। দুই কনস্টেবল।

দুই

দৃশ্যটা সহ্য করা কঠিন। তরতাজা একটা মেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। সিংগলবেড খাটের আড়াআড়ি। ঘিয়ে রং সালোয়ার পরা দুটো ফর্সা পা ঝুলছে খাটের বাইরে। ঘাড় বাঁয়ে হেলানো, ডান দিকের রগে এক গভীর গর্ত। কালচে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে সেখানে। লেপটে আছে খানিকটা চুলও। গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে মেয়েটির মাথা, বাঁদিক থেকেও রক্ত গড়িয়ে বিছানার চাদর কালচে লাল। দু'হাত দু'ধারে প্রসারিত, রিভলবার এখনও খসে পড়েনি ডান হাত থেকে। মেয়েটার ঠোঁট ঈষৎ খোলা, যেন শেষ মুহূর্তে চোখ বুজে কিছু বলতে চেয়েছিল। দেখে ভারি মায়া জাগে।

স্থানীয় থানার ওসি অজেয় সিন্‌হা ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। দু'পাশে দুই সহচর। দরজায় মিতিনকে দেখে অজেয় বলে উঠল,—কী ব্যাপার ম্যাডাম, আপনি এখানে?

অজেয়র সঙ্গে মোটামুটি হৃদ্যতা আছে মিতিনের। মাস তিনেক আগে একটা তদন্তের সময়ে আলাপ হয়েছিল। বছর পঁয়তাল্লিশের গাঁট্টাগোট্টা লোকটা ঠিক আর পাঁচটা পুলিশের মতো নয়। সামান্য হামবড়া ভাব আছে বটে, তবে মগজটা বেশ সাফ। মিতিন আলগা হেসে জানাল আগমনের কারণটা। পার্থ, তমালের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল।

তমালই ফ্ল্যাটটার মালিক শুনে অজেয়র দৃষ্টি ধারালো। আপাদমস্তক জরিপ করছে তমালকে।

সঙ্গেসঙ্গে কেঁপে গেছে তমাল। ঢোক গিলে বলল,—আমাকে সুকন্যা আসতে বলল...মানে যে এই মেয়েটির সঙ্গে থাকে...মানে থাকত...তুৎ থাকত কেন বলছি, এখনও তো থাকে...

—বুঝেছি। আপনি খুব ঘাবড়েছেন। অজেয়র ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি,—এসে ভাল করেছেন। নইলে আমিই ডেকে পাঠাতাম।

—আমি কিন্তু কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন।

—সে আমি দেখে নেব। এখন কাইন্ডলি বাইরে ওয়েট করুন। না বলে চলে যাবেন না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

কাঁচুমাচু মুখে বেরিয়ে গেল তমাল। তাকে সঙ্গ দিতে পার্থও। দরজাটা টেনে দিয়ে খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অজেয়। মিতিনকে জিজ্ঞেস করল,—দেখে কী মনে হচ্ছে ম্যাডাম? সুইসাইড?

মিতিন পাল্টা প্রশ্ন জুড়ল,—আপনার কী ওপিনিয়ন?

—একটু যেন গড়বড়ের আভাস পাচ্ছি।

—কী রকম?

—রিভলবারের পজিশানটা লক্ষ করুন। অ্যাপারেন্টলি মনে হবে আঙুলে ধরা আছে, কিন্তু আদতে ধরে নেই। ইউজুয়ালি তর্জনীটা ট্রিগারে থাকা উচিত ছিল, অথচ তার বদলে বুড়ো আঙুল...।

—হুম্। একটু অস্বাভাবিক তো বটেই। মিতিন কাছে গিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখল,—বুড়ো আঙুল দিয়ে ট্রিগার টিপে সুইসাইড?

—একেবারে অসম্ভব হয়তো নয়। তবে খুব ডিফিকাল্ট। তা ছাড়া কবজির ওপর কনট্রোল থাকবে না তো, সুতরাং গুলিও খুব শার্পলি স্কালে এনট্রি নেবে না। প্লাস, মাথার অন্য দিক দিয়ে যখন বেরোবে, তখন হাইটের অদলবদল ঘটে যাবে। ঠিক কী না?

—কারেক্ট। অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট।

—অথচ দেখুন...। অজেয় সন্তর্পণে মৃতদেহর মাথা অল্প ঘোরাল,—বাঁ সাইড দিয়ে গুলি কিন্তু শার্পলি [illegible]িয়েছে। গুলিটাও পেয়েছি। বসে থাকা অবস্থায় সেম হাইটে ট্রাভেল করে যেখানে যাওয়ার কথা, মোটামুটি দেওয়ালের সেখানেই হিট করেছে।

বুলেটের ঠোক্করে দেওয়ালের চটলা ওঠা জায়গাটুকু ভালভাবে নিরীক্ষণ করে এল মিতিন। মনে মনে তারিফ করল অজেয়র পর্যবেক্ষণ শক্তিকে। মুখে বলল, —তা এর থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছেন?

—আত্মহত্যাটা কেমন যেন সাজানো সাজানো লাগছে ম্যাডাম।...ঘরে তো কোনও সুইসাইড নোটও পেলাম না।

—খুঁজেছেন ভাল করে?

—না। রাফলি যা চোখে পড়ল। সুইসাইড নোট তো কেউ লুকিয়ে রাখে না।

—তা বটে।

দরজায় টকটক। পাল্লা খুলতেই ক্যামেরা হাতে পুলিশের ফটোগ্রাফার। ডিগডিগে লম্বা লোকটা ঢুকেই পটাপট মৃতদেহের ছবি তুলতে শুরু করেছে। নানান কোণ থেকে।

এই ফাঁকে মিতিন ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখে নিচ্ছিল। দিব্যি সাজানো কক্ষ। লাগোয়া বাথরুম। খাট, ছোট আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, সবই আছে ঘরে। রট আয়রনের টেবিল-চেয়ারও আছে এক সেট। চেয়ারটার মুখ বিছানার দিকে ফেরানো। টেবিলে গল্পের বই গোটা চার পাঁচ। সবই ইংরেজি নভেল। থ্রিলার নয়, সামাজিক উপন্যাস। এ ছাড়া রয়েছে রাইটিং প্যাড, পোর্সিলিনের বাহারী কলমদানিতে বেশ কয়েকটা ডটপেন, একখানা ঢাউস ভ্যানিটিব্যাগও। এবং একটি অ্যাশট্রে। তিন চারটে সিগারেটের পোড়া টুকরো-সহ। অ্যাশট্রের পাশে মোবাইল, বেশ দামি সেট। বিদেশি সিডি প্লেয়ারও রয়েছে দেওয়াল ঘেঁসে। এক গোছা সিডিও।

সিগারেটের টুকরোগুলো ঝুঁকে দেখতে দেখতে মিতিন অস্ফুটে বলল, —তৃষ্ণা মেয়েটা স্মোক করত?

—তাই তো দেখছি। অজেয়র তুরন্ত জবাব,—তবে খেয়াল করুন, দু'ধরনের ব্র্যান্ড আছে।

—হুঁ। একটা ফিল্টার উইল্‌স, আর তিনখানা ইন্ডিয়ান ক্লাসিক।

—অর্থাৎ ঘরে সম্ভবত কেউ একজন এসেছিল। চেয়ারের অ্যাংগেলও সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।...ও হ্যাঁ, আর একটা জিনিসও মিলেছে। ওই গ্রিন ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে। দ্যাট্‌স অলসো ইন্টারেস্টিং।

—কী জিনিস?

—এ-টি-এম থেকে টাকা তোলার রিসিট। কালই পনেরো হাজার টাকা উইথড্র করেছিল মেয়েটা। দুপুর বারোটা চব্বিশে।

—ইজ ইট?

—ইয়েস ম্যাডাম। মেয়েটার ব্যাগে কিন্তু টাকাটা নেই। অজেয় মাথা দোলাল,—এবার বুঝছেন তো কেন আমার আত্মহত্যায় খটকা জাগছে?

—তা টাকাটা তো অন্য কোথাও রাখা থাকতে পারে। আলমারিতে, কিংবা ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে...

—সর্বত্রই খুঁজে দেখব। তবে আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, দ্যাট মানি ইজ মিসিং।

—হুম্। আর কিছু পাননি বাস্কেট থেকে? মিতিন লেখার প্যাডটায় আলতো চোখ বোলালো,—কোনও ছেঁড়া কাগজ-টাগজ?

—না। বাস্কেট প্রায় ফাঁকাই ছিল।

ছবি তোলার পর্ব শেষ। ফটোগ্রাফার বেরিয়ে যেতে হঠাৎই ব্যস্ত হয়েছে অজেয়। কনস্টেবলকে ডেকে মহিলা এ-এস-আইকে পাঠিয়ে দিতে বলল ঘরে। সুরতহাল হবে। মিতিনকে বলল,—চলুন ম্যাডাম, আমরা নয় বাইরে বসি।

ছোটখাটো এল্ শেপ ড্রয়িংহলের একদিকে খাবার জায়গা, অন্য দিকে বসার। তমাল মন্দ সাজায়নি ফ্ল্যাটটাকে। তিনখানা বেতের সোফা, সেন্টারটেবিল, আর এক কোণে রাখা টিভিতে বসার জায়গাটুকু প্রায় ভরাট, তবে দেখতে মন্দ লাগে না। ল্যাম্পশেডগুলো বাহারী, রীতিমতো দামি। এ পাশে গোল ডাইনিংটেবিল ঘিরে সুদৃশ্য চারখানা চেয়ার। লাগোয়া খোলা কিচেনে গ্যাস, মাইক্রোওভেন, অ্যাকোয়াগার্ড, ফ্রিজ, আধুনিক সবরকম সরঞ্জামই মজুত। মেয়েদের এখানে রেঁধেবেড়ে খেতে কোনও অসুবিধেই নেই।

পার্থ আর তমাল চিন্তিত মুখে বড় সোফায়। পার্থ সিগারেট টানছে, তমাল বেশ জড়োসড়ো। ভেতরে প্রতিবেশীদের থাকতে অনুমতি দেয়নি পুলিশ, তবে খোলা দরজার বাইরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে একটা আধটা মুখ। সুকন্যা ডাইনিংটেবিলে, মাথায় হাত দিয়ে বসে। দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে এখনও ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি।

সুকন্যাকে ঝলক দেখে নিয়ে মিতিন বসল সোফায়। পাশেরটায় অজেয়। তমালের চোখে চোখ রেখে অজেয় প্রশ্ন ছুঁড়ল,—আপনিই তবে গৃহস্বামী?

থমথমে পরিবেশ বুঝি লঘু করতে চাইল পার্থ। টুক করে টিপ্পনী কেটেছে,—ফ্ল্যাটস্বামীও বলতে পারেন।

—খাসা বলেছেন তো। শব্দটা মাথায় থাকবে। অজেয় মৃদু হাসল,—তা তমালবাবু, আপনি খবরটা ঠিক ক'টায় পেলেন?

তমাল গলা ঝেড়ে বলল,—দেড়টা নাগাদ। সুকন্যাই ফোন করেছিল।

—তৃষ্ণা মেয়েটার সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি মোটামুটি জানতেন? আই মিন, কোথ্থেকে এসেছে, বাড়িতে কে কে আছে, কী চাকরি করে...?

—হ্যাঁ, সে তো জেনে রাখতেই হবে। তমাল সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করছে, —ইনফরমেশানগুলো যথাসাধ্য ভেরিফাইও করে নিয়েছিলাম। তৃষ্ণার বাবা-মা বছর দশ বারো আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন। তারপর থেকে মেয়েটা মামার বাড়িতেই থাকত। ভাইবোন নেই, কাজ করত

এক্স ফ্যাক্টর নামে সল্টলেকের এক কলসেন্টারে, মাইনে ছিল অ্যারাউন্ড কুড়ি হাজার।

—কলকাতায় মেয়েটির কোনও আত্মীয়স্বজন...?

—সম্ভবত নেই। অন্তত আমাকে তো সেরকমই জানিয়েছিল।

—মামার বাড়ির অ্যাড্রেস নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?

—অবশ্যই। তমাল তাড়াতাড়ি হিপপকেট থেকে পার্স বার করেছে। পার্সে একগাদা ভিজিটিং কার্ড। হাতড়ে হাতড়ে তার থেকে একটা বেছে নিয়ে বলল,—এই তো, এর পেছনে লিখে রেখেছি। মামার নাম চয়ন ব্যানার্জি, গোরাবাজার, হিন্দুস্তান সুইট্সের পাশের গলি, বহরমপুর...। মামার মোবাইল নম্বরও রয়েছে।

—মামাকে খবর দেওয়া হয়েছে?

—না-মানে আমি তো ঠিক ...। সুকন্যা যদি দিয়ে থাকে...

—সঙ্গে সঙ্গে অজেয়র চোখ সুকন্যায়। মেয়েটা এখনও মুখ ঢেকে বসে। এতসব কথোপকথন কানে যাচ্ছে কি না বোঝা দায়। তাকে দেখে নিয়েই অজেয় বলল,—ঠিক আছে, কার্ডটা আমায় দিন। আমরাই যোগাযোগ করে নিচ্ছি।

ঠিকানাটা অজেয়র হাতে তুলে দিয়ে খানিকটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তমাল। বলল,—আশা করি আমার আর কিছু করার নেই?

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। দু-চারটে প্রশ্নের জবাব তো দিতে হবে।

—ক্‌ক্‌কী? কী?

—তেমন কিছু নয় তমালদা, উনি কিছু রুটিন কোয়েশ্চেন করবেন। মিতিন আশ্বস্ত করল,—যেমন ধরুন, তৃষ্ণার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, কদ্দিন আছে এখানে, বন্ধুবান্ধব আছে কি না...। তারপর ধরুন, কাল তো আপনি দুপুরে এসেছিলেন। তখন আপনার সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল...

সাজিয়ে গুছিয়ে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেল তমাল। থেমে থেমে। ভেবে ভেবে। সতর্ক ভঙ্গিতে। ভাবলেশহীন মুখে জবাবগুলো শুনল অজেয়। শুনতে শুনতেই হঠাৎ প্রশ্ন,—আপনি কি সিগারেট খান?

তমাল থতমত মুখে বলল,—হ্যাঁ মানে... খুব বেশি স্মোক করি না, দিনে বড় জোর এক প্যাকেট।

—বাঁধা ব্র্যান্ড আছে কোনও?

—ফিল্টার উইল্‌স।

—কাল এখানে এসে কি সিগারেট ধরিয়েছিলেন?

—ধরিয়েছিলাম কি? তমাল মাথা চুলকোচ্ছে। একটু সময় নিয়ে বলল, —নিখুঁত মনে নেই। তবে বোধহয় একটা...কেন বলুন তো?

—এমনিই। জেনে রাখছি। তখন অ্যাশট্রে কোথায় ছিল?

—এখানেই তো থাকে! এই সেন্টার টেবিলটায়। তমাল এদিক-ওদিক চোখ চালাল,—অ্যাশট্রেটা দেখছি না তো! গেল কোথায়?

—ওটা এখন তৃষ্ণার ঘরে। অজেয়র বদলে মিতিনই বলল এবার, —আচ্ছা তমালদা, তৃষ্ণা কোন ব্যান্ডের সিগারেট খেত?

—তৃষ্ণা স্মোক করত নাকি? তমাল রীতিমতো বিস্মিত,—কই, দেখিনি তো।

—খেতেও পারে। পার্থ বিজ্ঞের মতো রায় দিল,—হয়তো তোর সামনে কখনও ধরায়নি।

—তা অবশ্য হতে পারে। আমাকে বেশ সমীহ করত মেয়েটা।

অজেয় চোখ কুঁচকে দেখছিল তমালকে। বলল,—আচ্ছা, আপনার কথা অনুযায়ী তৃষ্ণা আপনার সঙ্গে বেরিয়েছিল...ঠিক ক'টায় আপনি ওকে গাড়ি থেকে নামিয়েছিলেন?

—তখন ক'টা বাজে!...এই ধরুন গিয়ে, সওয়া বারোটা, কী বারোটা কুড়ি।

—নেমে মেয়েটা কোথায় গেল? কোনও দোকান-টোকানে?

—না বোধহয়। ওদিকে একটা এ-টি-এম আছে...স্টেট ব্যাংকের...সম্ভবত সেদিকেই...

—সম্ভবত নয়। মেয়েটা তখন টাকা তুলতেই গিয়েছিল। অজেয় সোজা হয়েছে,—আচ্ছা, গাড়িতে যাওয়ার সময়ে মেয়েটার সঙ্গে আপনার কী কী কথা হয়েছে?

—তেমন কিছু নয়। তবে একটু যেন চুপচাপই ছিল।

—খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল কি তৃষ্ণাকে?

—তা মনে হয়নি। কিংবা কী জানি, হয়তো সেভাবে খেয়ালই করিনি।

—বটেই তো। খামোখা খেয়াল করতে যাবেনই বা কেন? অজেয়র চোখে ধূর্ত হাসি;—যাক গে যাক, মেয়েটার কাছে যে একটা রিভলবার ছিল, সেটাও নিশ্চয়ই বিয়ন্ড ইওর নলেজ?

—একশো পারসেন্ট। ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। তাহলে মেয়েটাকে আমি মোটেই থাকতে দিতাম না।

পরের প্রশ্ন করার আগেই মহিলা পুলিশটি বেরিয়েছে দরজা খুলে। বলল,—হয়ে গেছে স্যার।

—পেলেন কিছু? আর কোনও ইনজুরি-টিনজুরি?

—না স্যার।

—এবার তাহলে ফিংগার প্রিন্টের ছাপ-টাপগুলো নিয়ে ফেলুন। রিভলবার, চেয়ার, টেবিল, মোবাইল, অ্যাশট্রে, আলমারির হাতল...। তারপর লাশটা রিমুভ করার বন্দোবস্ত করুন।

—ও-কে স্যার।

দরজায় দাঁড়ানো কনস্টেবলকে নিয়ে মহিলা ফের ঢুকল তৃষ্ণার ঘরে। সুকন্যাও উঠেছে চেয়ার ছেড়ে। থমথমে মুখে এগিয়ে এসে অজেয়কে বলল,—মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, আমি কি একটু আমার রুমে যেতে পারি?

—অবশ্যই। আপনি রেস্ট নিন না, আমরা আপনার সঙ্গে পরে কথা বলছি।

তৃষ্ণার ঘরের মুখোমুখি সুকন্যার ঘর। মাঝে ডাইনিং স্পেসের ব্যবধান। পায়ে পায়ে ভেতরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল সুকন্যা।

অজেয় ফের পড়েছে তমালকে নিয়ে। এবার অবশ্য তার প্রশ্ন অন্যরকম, —আচ্ছা তমালবাবু, এই হাউজিংয়ে মোট ক'টা ফ্ল্যাট?

—ন'টা। প্রতি তলায় তিনটে করে।

—আর গ্রাউন্ড ফ্লোরে তো গাড়ি রাখার জায়গা?

—কেয়ারটেকারের রুমও আছে। প্লাস পাম্প আর জেনারেটারের ঘর।

—আর চারতলার মাথায় তো ছাদ, তাই না?

—হ্যাঁ।

—ওপরে কোনও ছোট্ট ঘর-টর আছে কি? মানে কেউ থাকে-টাকে?

—না। শুধু লিফ্ট-রুম আর জলের ট্যাঙ্ক।

—এই ফ্লোরে আর কারা কারা থাকে?

—আমার ঠিক অপোজিটেরটা এক এন-আর-আইয়ের। বোস্টন নিবাসী। দু তিন বছর অন্তর অন্তর এলে এখানেই ওঠে, বাকি সময়ে আন্ডার লক অ্যান্ড কি। আর ওপাশে একটা ছোট ফ্যামিলি। হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, আর একটি বাচ্চা। জয়ন্ত আর সীমা। জয়ন্ত ব্যাংকের অফিসার, সীমা হাউসওয়াইফ।

—ওই ফ্যামিলির সঙ্গে তৃষ্ণাদের জানপহেচান কী রকম?

—বিশেষ বন্ধুত্ব আছে বলে তো আমার মনে হয় না। কী করে হবে বলুন? মেয়ে দুটোর সময় কোথায়? সারা রাত ডিউটি, এসে টেনে ঘুম, বেলায় উঠে নিজেদের জন্য খুচখাচ রান্নাবান্না, তারপর বিকেল হলেই ফের অফিসের জন্য তৈরি হওয়া—ব্যাস্, এই তো এদের রোজনামচা। তবে হ্যাঁ, মিসেস দত্ত...মানে পাশের ফ্ল্যাটের ওই মহিলা বেশ গায়ে পড়া গোছের। উনি বোধহয় যেচে কথা টথা বলতেন।

—অ। আর নীচের ফ্লোরের কেউ?

—জানি না। সুকন্যা ভাল বলতে পারবে। তমালের চোখ পিটপিট, —কিন্তু তৃষ্ণার সুইসাইডের সঙ্গে হাউজিংয়ের অন্য লোকদের কী সম্পর্ক?

—হয়তো কিছুই নেই। আবার থাকতেও তো পারে। জাস্ট চারপাশটা একটু বুঝে নিতে চাইছিলাম আর কী।

—ও। তমাল আরও স্বচ্ছন্দ হয়েছে। উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, —একটা কথা জানতে পারি স্যার?

—বলুন?

—তৃষ্ণা কি কালই মারা গেছে? নাকি আজ?

—কালই। তবে এগ্‌জ্যাক্ট টাইম বলতে পারব না। ওটা পোস্টমর্টেমে জানা যাবে।

—রাফ্‌লি ধরুন, সন্ধে ছ'টা থেকে ন'টার মধ্যে কোনও এক সময়ে। নিশ্চুপ মিতিন অনেকক্ষণ পর মুখ খুলেছে,—রিগরমর্টিস তো দেখলাম ছেড়ে গেছে। ঠিক কি না অজেয়বাবু?

—হুম্।

—সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, মৃত্যুর পর অন্তত আঠারো ঘণ্টা তো পেরিয়েছেই।

—আহা রে। পার্থর গলায় সমবেদনা,—আত্মহত্যা করে সেই কাল সন্ধে থেকে পড়ে, অথচ কেউ জানতেও পারল না...

—আমরা কিন্তু শিওর নই, কেউ জানত কি না। কিংবা জানতে পেরেছিল কি না।

—মানে?

—একটা গুলি কিন্তু চলেছে। অজেয়র স্বর গম্ভীর,—এখন দেখতে হবে গুলির আওয়াজ কেউ শুনেছে কি শোনেনি, কিংবা শুনেও চেপে যাচ্ছে কিনা, অথবা ঠিক ক'টার সময় শুনেছে...

—আর এসব জেনে কী লাভ? পার্থ তবু উদাস,—মেয়েটা পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল, অ্যান্ড শি হ্যাজ লেফট দি আর্থ।

—চেয়েছিল কি? না যেতে হয়েছে?

—মানে? পার্থর চোখ বড় বড়।

—অবাক হবেন না মিস্টার মুখার্জি। অজেয়র স্বর আরও গম্ভীর, —বলতে বাধ্য হচ্ছি, তৃষ্ণা সুইসাইড করেনি। খুন হয়েছে। ব্রুটালি।...কী ম্যাডাম, আপনি একমত তো?

—অ্যাপারেন্টলি সেরকম দেখাচ্ছে বটে। মিতিনকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল,—চলুন, সুকন্যার সঙ্গেও একটু কথা বলি।

তিন

সুকন্যা শুয়ে ছিল বিছানায়। আড়াআড়ি হাতে চোখ ঢেকে। দরজা টেনে মিতিন ঢুকতেই চমকে তাকিয়েছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল,—ও, আপনি? আসুন।

খানিক আগে তৃষ্ণার দেহ চলে গেছে পুলিশ হেপাজতে। তখন একবার বেরিয়েছিল সুকন্যা, বান্ধবীকে বিদায় জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরেছিল ঘরে। এখনও মেয়েটার চোখের কোলে জল।

মিতিন সামনে গিয়ে বসল। মেয়েটা সুশ্রী, তবে চেহারায় যেন তেমন কোমলতা নেই। মুখমণ্ডলে হালকা বিষাদের আস্তরণ।

নরম গলায় মিতিন বলল,—খুব খারাপ লাগছে, তাই না?

সুকন্যা উত্তর দিল না। চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

মিতিন মধুর স্বরে বলল,—জানি তোমার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আমরাও যে নিরুপায়। দুটো চারটে প্রশ্ন যে করতেই হবে।

এবার স্বর ফুটেছে,—কী জানতে চান বলুন?

—আপনি কবে আসানসোল গেছিলেন?

—আমায় আপনি 'তুমি' বলতে পারেন।...আমি পরশু বাড়ি গিয়েছিলাম।

—কখন?

—সকালের ব্ল্যাক ডায়মন্ডে। অফিস থেকেই সোজা হাওড়া স্টেশন চলে যাই।

—কাল ছুটি ছিল বুঝি?

—শনিবারটা আমাদের ছুটি থাকে।

—বিশেষ কোনও কারণ ছিল বাড়ি যাওয়ার? না মাঝে মাঝেই যান?

—মাসে একবার অন্তত যাই। তবে এবার যাওয়ার একটা স্পেসিফিক রিজন্ ছিল। দাদার বিয়ের ঠিক হয়েছে, মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা ডেকেছিলেন।

—তোমার বাবা তো কোল ইন্ডিয়ায় চাকরি করেন, তাই না?

—কার কাছে শুনলেন? তমালদা?

—হ্যাঁ, উনি আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু। আর আমি...

—আপনাকে আমি চিনি। ক'দিন আগেই একটা টিভি ইন্টারভিউতে দেখেছি। ডিটেকটিভ হিসেবে আপনার তো এখন বিশাল নাম। সুকন্যার ঠোঁটে চিলতে হাসি,—আমার বাবা ঠিক কোল ইন্ডিয়ায় নেই, তবে ওখানকার কনট্রাকটর। আসানসোলেই আমাদের বাড়ি ঘর সব কিছু। দাদাও বাবার সঙ্গেই কাজ করে।

—ও।...তুমি আজ কোন ট্রেনে এলে?

—কোলফিল্ড এক্সপ্রেস।

—এখানে পৌঁছলে কখন?

—প্রায় সাড়ে বারোটা। ট্রেনটা আজ ঘণ্টাখানেক লেট ছিল। তারপর ট্যাক্সি ধরে আসতে আসতে ...রাস্তায় একটু জ্যাম, ব্রেবোর্ন রোডের মুখে একটা গাড়ি খারাপ হয়েছিল...

—তা এসে প্রথমে কী দেখলে?

সুকন্যা একটুক্ষণ স্থির। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল,—প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারিনি। নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢুকেছি...যেমন ইউজুয়ালি ঢুকি। তৃষ্ণার দরজা তখন বন্ধ...যেমন থাকে। দু-একবার চেঁচিয়ে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না, ভাবলাম বুঝি ঘুমোচ্ছে। আমিও আর ডিসটার্ব না করে রুমে চলে এলাম। গিজার চালিয়ে স্নান করলাম ভাল করে। আসার পথে কয়েকটা স্যান্ডুইচ কিনে এনেছিলাম...ভেবেছিলাম কী রান্না থাকে না থাকে তার ঠিক নেই, দুপুরে স্যান্ডুইচ খেয়ে নেব। প্লেটে স্যান্ডুইচটা নিয়ে বসে আবার একবার ডাকলাম তৃষ্ণাকে। তখনও সাড়াশব্দ না পেয়ে কেমন যেন সন্দেহ হল। সকালে এসে ঘুমোলেও আমরা সাধারণত বারোটা, সাড়ে বারোটার মধ্যে উঠে পড়ি। অথচ সওয়া একটা বাজে, এখনও তৃষ্ণা শুয়ে আছে...!

—তখন তুমি ওর দরজায় ধাক্কা দিলে?

—এগ্জ্যাক্টলি। ভেবেছিলাম ভেতর থেকে বন্ধ। কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে ওই দৃশ্য। সুকন্যা ফের দু'হাতে মুখ ঢেকেছে, —উফ্, ভুলতে পারছি না, ভুলতে পারছি না।

স্থিত হওয়ার জন্য সুকন্যাকে সামান্য সময় দিল মিতিন। কোলের ওপর পড়ে থাকা সুকন্যার হাতে চাপ দিচ্ছে মৃদু। সান্ত্বনামাখা গলায় বলল, —থাক, ওই সিন্ আর মনে করতে হবে না।

—চেষ্টা করলেও কি মন থেকে মুছবে কোনওদিন? সুকন্যা নাক টানল, —তৃষ্ণা যে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।

—তুমি তখন কী করলে? তমালদাকে ফোন?

—প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। গলা দিয়ে কোনও শব্দই বেরোচ্ছিল না। তারপর কী করব ভেবে না পেয়ে পাশের ফ্ল্যাটের দাদা-বউদিকে ডাকলাম। সীমা বউদি তো দেখেই হাউমাউ কাঁদতে আরম্ভ করলেন, আর জয়ন্তদা ফোন করলেন থানায়। আমিও মোবাইলে তমালদাকে...

কথা শেষ হল না, তার আগেই অজেয় ঢুকেছে ঘরে। একবার সুকন্যাকে দেখল, একবার মিতিনকে। দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল,—নাহ্, পাওয়া গেল না।

—ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়াবগুলো দেখেছেন? মিতিনের ভুরু জড়ো, —বইয়ের ভাঁজটাজগুলো?

—সব। সব। বিছানা, বালিশ, আলমারি, এমনকী বাথরুমের পুচকে কাবার্ডটাও। বেমালুম উবে গেছে।

—হুঁ, তাহলে আপনার সিক্সথ সেন্সই সঠিক।

—আর একটা ব্যাপারেও ষষ্ঠেন্দ্রিয় আমাকে প্রপারলি গাইড করেছে ম্যাডাম।

—কী বলুন তো?

—সে পরে জানবেন। আগে মিস সুকন্যার সঙ্গে কথাগুলো সেরে নিই। চেয়ার টেনে বসল অজেয়। হাল্কা গলায় মিতিনকে বলল,—আপনি তো দেখছি আগেই বাতচিৎ স্টার্ট করে ফেলেছেন।

—তেমন কিছু এগোইনি। মিতিন অল্প হাসল,—জাস্ট শুনছিলাম কখন সুকন্যা বডিটা দেখল, তারপর কী করল...।

—বেশ। বেশ। অজেয় ঈষৎ ঝুঁকেছে। সুকন্যাকে জিজ্ঞেস করল, —আচ্ছা, আপনার বান্ধবীর যে একটা রিভলবার আছে, আপনি জানতেন?

—ওটা তো তৃষ্ণার নয়। আমার।

এমন একটা উত্তরের জন্য মিতিন, অজেয়, কেউই প্রস্তুত ছিল না। দু'জনেই চমকেছে। প্রায় কোরাসে বলে উঠল,—হোয়াট?

সুকন্যা যথেষ্ট সপ্রতিভ ভাবেই বলল,—হ্যাঁ, ওটা আমার। আই মিন, আমার বাবার। আসানসোল বেল্ট তো খুব সুবিধের নয়, গুণ্ডা মাফিয়ার ভয় রয়েছে। আর বাবা যে ধরনের কাজ করে...হি ইজ আ সিভিল কন্ট্রাক্টর...সেখানে পদে পদে বিপদ। তাই বাবা রিভলবার রাখে। বন্দুকও আছে বাবার। দুটোরই লাইসেন্স রিনিউ করা হয়।

—তা আপনি বাবার রিভলবার নিয়ে চলে এসেছিলেন?

—নিয়ে আসিনি। বাবা জোর করে সঙ্গে দিয়েছিল।

—কেন?

—মাস চারেক আগে ব্যাঙ্গালোরে কলসেন্টারের একটি মেয়ে বাড়ি ফেরার পথে খুন হয়। খবরটা দেখে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল বাবা। বলেছিল, তোরও তো বেখাপ্পা সময়ে কাজ, ব্যাগে রেখে দিবি, বিপদ এলে মোকাবিলা করতে পারবি।

মিতিন অবাক মুখে বলল,—তুমি রেগুলার অফিসে রিভলবার নিয়ে যাও নাকি?

—মোটেই না। আমার অত ভয়-ডর নেই। রিভলবার ড্রয়ারেই পড়ে থাকত।

—তুমি রিভলবার চালাতে পারো?

—মোটামুটি। কলেজে এন-সি-সিতে ছিলাম তো, তখন শুটিংয়েরও ট্রেনিং নিয়েছি। অজেয় সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল,—আপনার বান্ধবী কি রিভলবারের খবরটা জানত?

—অবশ্যই। কোথায় রাখি তাও ওর জানা ছিল।

—রিভলবার চালানোটাও দেখিয়েছিলেন কি?

—একদিন ক্যাজুয়ালি শিখিয়েছিলাম। কীভাবে সেফ্‌টি ক্যাচ তুলতে হয়, ট্রিগার টিপতে হয়, কেমন করে কব্‌জি সিধে রাখতে হয়...

সুকন্যা দিব্যি বলে চলেছে। মিতিন আর অজেয় মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। অজেয়র মুখে আলগা হাসি। বলল,—যাক, রিভলবারের ব্যাপারটা তাও খানিকটা ক্লিয়ার হল। ধন্দে ছিলাম, কী করে রিভলবার পেল...

—আমার রুম থেকেই নিয়ে গিয়েছিল। এবারও সুকন্যার স্মার্ট জবাব, —দরজা তো আমি লক করে যাইনি।

—অর্থাৎ আপনাদের পরস্পরের ঘরে অবাধ যাতায়াত ছিল?

—শিওর। আমরা দু'জনে খুবই বন্ধু ছিলাম।

—কবে থেকে বন্ধুত্ব আপনাদের?

—অফিসে জয়েন করার পর থেকেই।

—দু'জনে কি একসঙ্গেই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন?

—না। তৃষ্ণা আগেই এক্স ফ্যাক্টরে ছিল। আমি পরে আসি। টালিগঞ্জে একটা ফ্যামিলিতে পেয়িংগেস্ট থাকত তৃষ্ণা, আমি একটা দঙ্গলের সঙ্গে হাজরায়। আমাদের দু'জনেরই প্রাইভেসির খুব অসুবিধে হচ্ছিল, তাই নিউজপেপারে অ্যাড দেখে এই ফ্ল্যাটটা দেখতে আসি। তারপর থেকে তো একসঙ্গেই ছিলাম।

—এবং বন্ধুত্বও আরও গাঢ় হয়েছে, তাই তো?

—বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে ভালই মনের মিল ছিল।

—কক্ষনো রাগারাগি হয়নি?

—নেভার। রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটির প্রশ্নই আসে না। সুকন্যাকে ঈষৎ উদাস দেখাল,—ও এত সুইট, চার্মিং, সফ্ট...। আমি বরং একটু বদমেজাজী। হয়তো দুম করে কিছু একটা শুনিয়ে দিলাম...তৃষ্ণা কিন্তু একটুও চটত না, ঠোঁট টিপে খালি হাসত।

—তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে অনেক মনের প্রাণের কথাও হত? অজেয় হেলান দিয়েছে চেয়ারে,—তৃষ্ণার কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল কি না তাও নিশ্চয়ই জানেন?

—জানি। সুকন্যা মাথা নাড়ল,—কৌশিক। ওরা বিয়ে করবে বলেও ঠিক করেছিল।

—তাই নাকি? কৌশিক কী?

—কৌশিক রায়। সিটি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

—থাকে কোথায়?

—ঠিকানাটা জানি না, তবে নিউ আলিপুরের ওদিকে। মোবাইল নাম্বার আছে।

—তৃষ্ণার খবরটা দিয়েছেন কৌশিককে?

—না তো। দেওয়া হয়নি তো। সুকন্যা হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল,—এখন ফোন করব? বলব?

—থাক, দরকার নেই। অজেয় সামান্য অসন্তুষ্ট স্বরে বলল,—নম্বরটা দিন, আমি জানিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের অফিসেও নিশ্চয়ই ইনফর্ম করা হয়নি?

করুণ মুখে সুকন্যা বলল,—আমার একদম মাথা কাজ করছে না, বিশ্বাস করুন।

সুকন্যার শুকনো মুখখানা দেখছিল মিতিন। বুঝি বা কিছু পড়তে চাইছিল। ঠান্ডা গলায় বলল,—এরকমটা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয় সুকন্যা। চোখের সামনে হঠাৎ এমন একটা বিশ্রী ঘটনা...

অজেয় অবশ্য এতটুকু সদয় হয়নি। কেজো ভঙ্গিতে মেয়েটার কাছ থেকে একের পর এক টেলিফোন নম্বর নিচ্ছে। উঠে লাগোয়া বাথরুম থেকে একবার ঘুরে এল মিতিন। ফের বসেছে বিছানায়। আলতো দৃষ্টি বোলালো ঘরখানায়। দুটো ঘরে তমাল একই আসবাবপত্র দিয়েছে। ল্যাম্পশেডগুলোও হুবহু এক। তবে সুকন্যা বোধহয় গানটান শোনে না, মিউজিক প্লেয়ার নেই কোনও। টেবিলে ল্যাপটপ্ আছে একখানা। আর একরাশ ইংরেজি থ্রিলার।

যাবতীয় টেলিফোন নম্বর আর ঠিকানা পকেটস্থ করে অজেয় আবার জিজ্ঞাসাবাদে নেমেছে। ভারী গলায় বলল,—শুনুন, ওই কৌশিক সম্পর্কে আমার আরও কিছু জানা দরকার।

সুকন্যা নিচু গলায় বলল,—বলুন?

—কৌশিকের সঙ্গে তৃষ্ণার ভাব-ভালবাসাটা হল কী ভাবে?

—আমরা দু'জনে মাঝেসাঝে ডিস্‌কোয় যাই। মানে...যেতাম আর কী। লাস্ট জুলাইতে...। বলেই একটু ভেবে নিল সুকন্যা,—হ্যাঁ জুলাই মাসেই ব্লু হেভেনে প্রথম মিট করি কৌশিককে। মানে কৌশিকই এসে তৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করে। তারপর দু'জনে ইন্টিমেট হল, দেখা-টেখা করত...। ক্রিসমাসের সময়েই ওকে প্রোপোজ করেছে। মার্চে বিয়ের প্ল্যান করেছিল দু'জনে।

—কৌশিক কি এই ফ্ল্যাটেও এসেছে?

—বার চার পাঁচ। ওরা বাইরেই বেশি মিট করত।

—ছেলেটি কেমন?

—পয়সাওয়ালা বাবা, নিজেদের বাড়ি আছে, একমাত্র ছেলে, হিউজ মাইনে পায়, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি হাঁকিয়ে ঘোরে...। সুকন্যা হাত উল্টোল,—সার্টেনলি ভেরি এলিজিবল্ ব্যাচেলার।

—সে প্রশ্ন করিনি। জানতে চাইছি, ছেলেটা কেমন?

—খারাপ কেন হবে? ভালই তো। তৃষ্ণার ওপর যথেষ্ট টান ছিল।

—এটাও কিন্তু ঠিক আন্সার হল না। আমি ছেলেটার নেচার জানতে চাইছি।

এবার যেন একটু থমকেছে সুকন্যা। ঠোঁট টিপে আছে। বেশ কয়েক সেকেন্ড পর বলল,—নিন্দে করাটা বোধহয় উচিত হবে না। তবে আমার মনে হয়...

—হ্যাঁ, এই মনে হওয়াটাই শুনতে চাইছি।

—কৌশিক কেমন যেন ওভার পজেসিভ টাইপ। কনজারভেটিভ। নিজের সম্পর্কে ধারণাটা বড্ড বেশি হাইফাই। যেন আঠাশ বছর বয়সে ওর মতো কেউ রোজগার করে না।

—মনে হচ্ছে কৌশিককে আপনি পছন্দ করেন না?

—আমার পছন্দ অপছন্দে কী আসে যায়! তৃষ্ণা তো তার প্রেমেই হাবুডুবু খাচ্ছিল।

—আপনার ডিজলাইকিংটা তৃষ্ণাকে জানাননি?

—বলে কোনও লাভ হত কী? প্রেম তো মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

প্রসঙ্গে ছেদ পড়ল। দরজায় উঁকি দিয়েছে এক কনস্টেবল। ঘাড় ঘুরিয়ে অজেয় বলল,—কিছু বলবে?

—তমালবাবু চলে যেতে চাইছেন। ছেড়ে দেব?

—দাঁড়াও। আমি গিয়ে কথা বলছি।

অজেয় উঠে যেতে সুকন্যার মুখে যেন স্বস্তির ভাব। চাপা গলায় মিতিনকে জিজ্ঞেস করল,—উনি খুব দুঁদে অফিসার, তাই না?

—ভীষণ। মিতিন ফিক করে হাসল,—কেন, তুমি কি আনইজি ফিল করছ?

—না, না। তবে কোয়েশ্চেন শুনে মনে হচ্ছে উনি খুব মেথডিক্যাল। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

কী যেন বলতে গিয়েও ঝুপ করে গিলে নিল সুকন্যা। মাথা ঝাঁকাচ্ছে,—না, কিছু না।

মিতিন স্থির চোখে দেখল সুকন্যাকে। নিজেই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছে,—তুমি তো এসেই স্নান করেছিলে?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

—না...গিজারের জল এখনও গরম রয়েছে...

সুকন্যাকে যেন সামান্য অপ্রতিভ দেখাল। খানিক আড়ষ্টভঙ্গিতে বলল,—তাই বুঝি? তাহলে বোধহয় পরে অফ করেছি...

অজেয় ফিরেছে। হাতে তৃষ্ণার মোবাইলটা। মিতিনকে বলল,—সিজার লিস্ট তৈরি করে তমালবাবুকে দিয়ে সই করিয়ে নিলাম। ওঁকে ছেড়ে দিয়েছি, দরকার হলে আবার ডাকব।

—আর পার্থ? সে কোথায়?

—উনি কি আর আপনাকে ফেলে যেতে পারেন? ঘাড়ে ক'টা মাথা? অজেয় একগাল হাসল,—তবে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করেছেন, আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

মিতিন হেসে ফেলল,—তার মানে আমাদের দু'জনকে এখন অনন্তকাল আটকে রাখবেন, তাই তো?

—আরে, রোববারের দুপুর...বাড়িতে থেকেই বা করবেন কী? অজেয় মিটিমিটি হাসছে,—আপনি তো ক্রিমিনলজিতে এক্সপার্ট, দেখুন না আমরা বোকাসোকা পুলিশরা কীভাবে কেস হ্যান্ডেল করি।

—কেসটা অবশ্য আমারও ইন্টারেস্টিং লাগছে। মিতিন অপাঙ্গে সুকন্যাকে দেখল,—অন্তত এই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে।

চার

সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে। নরম সোনারং রোদ্দুর মেখে চরাচর ভারি মায়াবী এখন। সুকন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ মুলতুবি রেখে পার্থ-মিতিনকে ছাদে ডেকে এনেছিল অজেয়। কেয়ারটেকার সুশীলকে দিয়ে চা আনিয়েছে, চলছে গলা ভিজিয়ে নেওয়ার পালা এবং টুকটাক আলোচনাও। তৃষ্ণার মৃত্যুকে ঘিরে।

আবাসনের পাশেই একটা ফাঁকা প্লট। বাড়ি উঠবে শিগ্‌গিরই, ভিত খোঁড়া হয়ে গেছে। শেষ চুমুকটা দিয়ে ভাঁড় সেদিকে ছুড়ে দিল পার্থ। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,—কেস তাহলে জমে গেছে! সুইসাইডটা মার্ডারের দিকে গড়াচ্ছে!

—গড়িয়ে পৌঁছে গেছে মুখার্জি সাহেব। আমি এখন নাইনটি পারসেন্ট শিওর। আর একটা দুটো সুতো পেলেই যথেষ্ট। পার্থর বাড়ানো প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে ধরাল অজেয়। ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—তবে একটা ব্যাপার খুব স্ট্রেঞ্জ লাগছে।

মিতিনের চোখ টেরচা,—কী বলুন তো?

—মেয়েটার মামার বাড়ির বিহেভিয়ার। এমন একটা মর্মান্তিক সংবাদ শুনেও মামাটার যেন কোনও প্রতিক্রিয়াই হল না! বলল, মরে গেছে? তাই নাকি? কবে? নো আঁতকে ওঠা, নো শক, নাথিং! কাল পোস্টমর্টেম হবে শুনে শুধু জিজ্ঞেস করল, আমাদের তাহলে বডি রিসিভ করার জন্য যেতে হবে, তাই না?

পার্থ মন্তব্য করল,—পাষণ্ড। মেয়েটাকে একেবারে পর করে দিয়েছিল।

—হুম্। সাধে কি মেয়েটা বহরমপুরে যেত না! মামার হাবভাবে তো মনে হচ্ছিল, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

—তার নানান রকম কারণ থাকতে পারে। মিতিন রায় দিল,—মে বি শি ওয়াজ আনওয়ান্টেড দেয়ার। সম্পত্তির কারণে হতে পারে, কিংবা হয়তো বোঝা ভাবত...

—কীসের বোঝা? মেয়েটা তো ভাল চাকরি করে!

—সেইজন্যই তো একটু অবাক লাগছে। মিতিন খালি চায়ের ভাঁড় ছাদের কোণে নামিয়ে এলো,—যাক গে, গুলির আওয়াজের ব্যাপারে কিছু শুনলেন?

—এখনও সেভাবে কোয়্যারিটা করিনি।

—করে অবশ্য লাভও হবে না। একে শীতকাল, তার ওপর অঞ্চলটা মশার আড়ত, ডেফিনিট্‌লি সন্ধের আগে সব ফ্ল্যাটেরই জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর সকলের ঘরেই আজকাল যা গাঁকগাঁক টিভি চলে। মিতিন হাসল,—স্টেটমেন্ট নিয়ে দেখুন, প্রথমে বলবে না শুনিনি, তারপর বলবে একটা পটকার মতো আওয়াজ বোধহয় কানে এসেছিল...

—আবার সেই পটকা ফাটার টাইমগুলোও হবে আলাদা আলাদা। একজন বলবে পৌনে ছটা, তো অন্যজন সাড়ে সাতটা। আর তৃতীয় জন সাটে আটটা। কার কথা ধরবেন? অজেয় সিগারেটে লম্বা টান দিল, —আসলে ব্যাপারটা কী জানেন তো? আমরা মধ্যবিত্তরা হলাম গিয়ে গপ্পোবাজ ক্লাস। এদিকে ভয়ে গর্তে ঢুকে থাকি, ওদিকে চান্স পেলেই ফিকশান বানাই।

—তাহলে এখনই পাশের ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? পার্থ হাত উল্টোল,—অযথা টাইম নষ্ট।

—উঁহু। মহিলার কাছ থেকে কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে। কেয়ারটেকারের মুখে যা শুনলাম, মেয়ে দুটো এ বাড়িতে কারোর সঙ্গেই মিশত না, একমাত্র ওই মহিলার সঙ্গেই যা দুটো চারটে বাক্যালাপ হত।

—চলুন তাহলে। মিতিন কাঁধ ঝাঁকাল,—একটু টোকা মেরে দেখি।

তমালের ফ্ল্যাট আর জয়ন্ত দত্তর ফ্ল্যাট হুবহু এক। যেন দর্পণে প্রতিবিম্ব। তবে এদের লিভিং হলখানা অনেক গোছানো। দেখেই মালুম হয় সংসারী মানুষের ঘর।

মিতিনদের আগমনে জয়ন্ত যেন তেমন প্রসন্ন নয়। আপ্যায়ন করল বটে, তবে নিমপাতা খাওয়া মুখে বসেছে ডিভানে। পুলিশি ঝামেলায় কেইবা পড়তে চায়! জয়ন্তর পাশে গোলগাল সীমার চোখ অবশ্য চাপা কৌতূহলে চিকচিক। তাদের বছর দশ-এগারোর ছেলে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে। গোলগোল চোখে নিরীক্ষণ করছে উর্দিধারী অজেয়কে।

অজেয়ই শুরু করল, আপনাদের বেশি সময় নেব না। শুধু দু-একটা তথ্য জানার ছিল।

জয়ন্ত গোমড়া মুখে বলল,—দেখুন, ঘটনাটায় আমরা খুবই শক্‌ড। এই হাউজিংয়েরই একটা বদনাম হয়ে গেল। তবে আমাদের আর কীই বা বলার আছে! ওরা ওদের মতো থাকত, আমরা আমাদের মতো।

—কিন্তু আপনার মিসেসের সঙ্গে তো ওদের ভালই আলাপ-সালাপ...

—তেমন কিছু নয়। জাস্ট দেখা হলে হাই হ্যালো...

—অথচ সুকন্যা যে অন্যরকম বলল? অজেয় কায়দা করে ঢিল ছুড়ল একটা, —ম্যাডাম নাকি মাঝেমধ্যেই ওদের ফ্ল্যাটে যেতেন?

জয়ন্ত যেন বেশ বিব্রত এবার। মুখে কিছু বলল না, তবে বিরক্ত মুখে দেখল সীমাকে। ভাবটা এমন, এবার ঠেলা বোঝো!

সীমার অবশ্য তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরের অসন্তোষ উপেক্ষা করে কলকলিয়ে উঠেছে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যেতাম তো। দুটো ইয়াং মেয়ে বাড়িঘর ছেড়ে একা একা থাকছে, এমন একটা সার্ভিস করে যে খাওয়া-দাওয়া ঘুম-টুমের ঠিকঠিকানা নেই, কাজের মেয়েটা চার দিন আসে তো দু-দিন ডুব...মেয়েদুটোর একটু খোঁজখবর করব না? আফটার অল, আমাদেরই তো প্রতিবেশী, নয় কি?

—ঠিকই তো। বটেই তো। মিতিন তালে তাল দিল,—সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা। যদি তৃষ্ণার এই মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

—না বাবা, সুইসাইডের সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না। আমি নিজেই তো স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এমন শান্তশিষ্ট একটা মেয়ে...কী সুন্দর করে

কথা বলত...কোনও চালবাজি নেই, ভ্যানিটি নেই...বিশ্বাস করুন, আমার মনটা খুব খুব খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—হওয়ারই তো কথা।...আচ্ছা, তৃষ্ণা সুকন্যার তো খুব ভাব ছিল, তাই না?

—গলায় গলায়। মেয়েদের তো খুব বদনাম, দুটো মেয়ে একসঙ্গে হলেই নাকি খটাখটি বাধে। কিন্তু ওদের মধ্যে আমি কক্ষনো ঝগড়াঝাঁটি হতে শুনিনি। সুকন্যা অবশ্য একটু খরখরি টাইপ, স্লাইট গুমোর আছে। কেন গুমোর, কীসের ফাঁট, তা অবশ্য জানি না। তবে তৃষ্ণা একেবারেই গোবেচারা ধরনের। আহারে, কেন যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল!

—তৃষ্ণার শুনলাম একটি প্রেমিক ছিল? অজেয় খানিক অধৈর্য সুরে বলে উঠেছে,—আপনি তাকে কখনও দেখেছেন কী?

—এ প্রশ্নটা আমার মিসেসকে করার কিন্তু কোনও মানে হয় না। জয়ন্ত তড়িঘড়ি বলে উঠল,—ওদের প্রাইভেট অ্যাফেয়ার সীমা কী করে জানবে?

—না মানে...উনি বাড়িতেই থাকেন তো। মিতিন কথাটাকে সহজ করতে চাইল, যদি কখনও কাউকে চোখে-টোখে পড়ে থাকে। কিংবা তৃষ্ণা যদি ওঁকে বলে থাকে কিছু...

—সেভাবে কিছু বলেনি, তবে...। চকিতে জয়ন্তকে দেখে নিয়ে সীমা বলল,—দুজন আউটসাইডারকে আমি ওদের ফ্ল্যাটে আসতে দেখেছি। তাদের একজন তো কালও এসেছিল।

—কাল?

—হ্যাঁ।

—কখন? অজেয় প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল,—ক'টার সময়?

—আসার টাইমটা বলতে পারব না। কাল রনির ড্রয়িং ক্লাস ছিল, ছেলেকে নিয়ে পৌনে চারটের সময়ে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরি প্রায় ছটায়। তারপর কাল আমার বাপের বাড়িতে একটা গেট-টুগেদার ছিল। ভাইঝির জন্মদিন। আমার হাজব্যান্ডের অফিস থেকেই সেখানে চলে যাওয়ার কথা। জানেনই তো, ব্যাঙ্কে আজকাল কী রকম কাজের চাপ, শনিবারও তাড়াতাড়ি ছাড়া পায় না। তাই বলেছিলাম, তোমার আর বাড়ি আসার দরকার নেই...

মহিলা সত্যিই বেশি বকে তো! এবং বেশি কথা বললে যা হয়, বেলাইনে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। মিতিন হাত তুলে থামাল সীমাকে,—বুঝেছি, বুঝেছি। তা ছটা নাগাদ ফিরে কী দেখলেন আপনি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা বলতেই তো...। সীমা দম নিল,—ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে ড্রেস-ট্রেস বদলেই রওনা দেব। লিফ্‌টে উঠে আমাদের দরজার লক খুলছি, তখনই দেখি লোকটা ওদের ফ্ল্যাট থেকে বেরচ্ছে।...না, না, বাইরে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলছে।

—কী বলছিল?

—কী যেন...? হ্যাঁ...বলছিল, আমার যা বলার বলে দিলাম, এবার তুমি ভেবে দ্যাখো কী করবে...

—আপনি স্পষ্ট শুনলেন?

—হ্যাঁ। পাশাপাশিই তো দরজা। বড়জোর আট-দশ হাত।

—কীরকম টোনে বলছিল? ধমক? নাকি রিকোয়েস্ট?

—নরমাল ভাবেই।

—তৃষ্ণা কী জবাব দিল?

—নিশ্চয়ই বলল কিছু। শুনতে পাইনি। এমন নিচু স্বরে কথা বলে।

—ও। অজেয়র দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে,—আচ্ছা, তৃষ্ণা কি তখন হোমলি ড্রেসে ছিল? মানে-নাইটি-ফাইটি পরে? নাকি ওই শালোয়ার-কামিজটা...?

—বলতে পারব না। ও তো ভেতর দিকটায় ছিল।

—তবু...মনে করার চেষ্টা করুন।

—নাহ্, ওকে দেখা যাচ্ছিল না। মানে আমি দেখতে পাইনি।

—আপনার ছেলে তো সঙ্গে ছিল। অজেয় রনির দিকে তাকাল,—তুমি দেখেছ?

—না। রনি জোরেজোরে মাথা নাড়ল।

—হুম্। তারপর কী হল?

—দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সীমার তুরন্ত জবাব,—লোকটা লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে এল, আমরাও ঘরে ঢুকে গেলাম।

—এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড। অজেয়র দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর,—দরজাটা কে বন্ধ করল? তৃষ্ণা? না ওই লোকটা?

সীমা বুঝি থতমত খেয়েছে এতক্ষণে। চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করছে।—তৃষ্ণাই তো বোধহয়...

—না না, আন্টি নয়। রনি শুধরে দিল তাড়াতাড়ি,—ওই লোকটাই তো দরজা টেনে দিল।

—হুউউম্। অজেয়র মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে। হাসিতে যত

না সমস্যা নিরসনের আভাস, তার চেয়ে বেশি যেন আত্মপ্রসাদ। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,—তা এই লোকটাকে তো আপনি আগেও দেখেছেন?

—এক দু'বার।

—কেমন দেখতে? হাইট কী রকম? বয়স?

—বয়স আছে। সাঁইত্রিশ আটত্রিশ তো হবেই। বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। হাইট...এই আমার হাজব্যান্ডের মতো। পাঁচ ফুট সাত, কি আট। স্বাস্থ্য খারাপ নয়, বেশ ভুঁড়ি আছে। গায়ের রং একটু কালো ঘেঁষা। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা।

—আর মুখ চোখ?

—মন্দ নয়। দিব্যি জেন্টলম্যান।...বোধহয় তৃষ্ণার দাদা-টাদা, বা মামা-কাকা গোছের কেউ।

—তৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—আমি কারোর পারসোনাল ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্ট দেখাই না। যা মনে হয়, তাই বললাম।

মিতিন মন দিয়ে প্রশ্নোত্তর শুনছিল। এবার সে নাক গলিয়েছে,—আর দ্বিতীয় জন? তাকে কেমন দেখতে?

—সে তো এর থেকে অনেক ছোট। বড় জোর সাতাশ আঠাশ। বেশ হ্যান্ডসাম। দারুণ গ্র্যাভিটি আছে। সাদা সান্ত্রো গাড়ি নিয়ে আসত, তৃষ্ণাকে নিয়ে বেরিয়ে যেত।

—সুকন্যা কখনও ওদের সঙ্গে বেরয়নি?

—আমি দেখিনি।

—সুকন্যার কোনও বয়ফ্রেন্ড আসে ফ্ল্যাটে?

—নাহ্। ওই মেয়ের তো কম্পিউটারের নেশা। জেগে থাকলেই তো ল্যাপটপ খুলে বসে যায়। তা ছাড়া যা চ্যাটাং চ্যাটাং টাইপ, ওই মেয়ের কোনও বয়ফ্রেন্ড হওয়া মুশকিল।

—লাস্ট প্রশ্ন। গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন কি?

—চান্স নেই। মিনিট পনেরো বাদেই তো ফের বেরিয়ে গেলাম, ফিরেছি রাত দশটায়।

—তখন কি ওই ফ্ল্যাট থেকে কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ পেয়েছেন? টিভির? বা গান চলার?

—না।

—থ্যাংক ইউ। মিতিন টেরচা চোখে অজেয়কে দেখল,—মিস্টার সিন্‌হা, আপনার কি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?

—থাক। মোটামুটি এতেই এখন কাজ চলে যাবে। দরকার হলে পরে আবার আসব।

বাইরে এসে পার্থ একটা আড়মোড়া ভাঙল। ছোট্ট হাই তুলে বলল, —আর কী মিস্টার সিন্‌হা, এবার আস্তে আস্তে এগোন যাক।

অজেয় মিটিমিটি হাসছে,—ওয়েট, ওয়েট। এখনও তো আসল কাজই বাকি।

—কী কাজ?

—খুন ভাবলেই তো হবে না। মোটিভটাও তো বুঝতে হবে। সুতরাং সুকন্যা ম্যাডামকে আর একবার ঝাঁকি দেওয়া দরকার।

পাঁচ

সুকন্যা বুঝি তৈরিই ছিল। অজেয় মিতিনদের পুনরাগমনে তাকে তেমন বিচলিত দেখাল না। শুধু পার্থকে জরিপ করল ঝলক। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে হেলান দিয়েছে খাটের বাজুতে।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে অজেয় বলল,—আপনার সঙ্গে কয়েকটা ভাইটাল ব্যাপারে ডিসকাস করার ছিল। তৃষ্ণার মৃত্যু সম্পর্কে আমরা ভাল করে বুঝতে চাই।

সুকন্যার ভুরুতে প্রশ্নচিহ্ন,—বলুন?

—আপনার বান্ধবীর নেচার তো আপনি জানেন। মনে হয় কি সে সুইসাইড করতে পারে?

—আমার সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে। তৃষ্ণার স্বভাবের সঙ্গে আত্মহত্যা একদমই মেলে না।

—তৃষ্ণার কি রিসেন্টলি কোনও ডিপ্রেশান এসেছিল?

—রিজন তো দেখি না। দিব্যি অফিস-টফিস করছে, বিয়েও ঠিকঠাক...। ইনফ্যাক্ট, বিয়ের শপিংও তো শুরু করে দিয়েছিল।

—কৌশিক রায় না কে বললেন...তার সঙ্গে দু-চার দিনের মধ্যে কোনও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং...

—কাল পরশু কিছু হয়ে থাকলে জানি না। তার আগে অবধি তো শুনিনি।

মিতিন বসেছে খাটের অপর প্রান্তে। টপ করে বলল,—কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সে তোমার ঘর থেকে রিভলবারটা নিয়ে গিয়ে...

—এটাই তো আমার আরও বেশি অদ্ভুত লাগছে। সুকন্যা জোরের সঙ্গে বলল,—রিভলবার চালিয়ে আত্মহত্যা করল? তৃষ্ণার মতো মেয়ে?

—একান্তই অসম্ভব? কেন?

—দেখুন, ফ্র্যাংকলিই বলি। সুকন্যা সোজা হয়ে বসল,—তৃষ্ণার সঙ্গে আমার একদিন সুইসাইড নিয়ে কথা হচ্ছিল। হাল্কাভাবে। এই...মাস খানেক, মাস দেড়েক আগে। আমি বলেছিলাম, রিভলবার টিপে মৃত্যুটা মিনিমাম টাইম ডেথ। তৃষ্ণা বলল, ওরে বাবা, ও আমি পারবই না। তার চেয়ে স্লিপিং পিল ঢের ঢের ভাল। ঘুমের মধ্যেই শেষ।

অজেয় মুখ টিপে হাসছে। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই বলল,—আমি ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম।

—কেন?

—কারণ আমাদের মনে হচ্ছে, আপনার বান্ধবী সম্ভবত সুইসাইড করেননি। ইটস আ কেস অফ মার্ডার। ক্যালকুলেটেড ব্রুটাল হোমিসাইড।

—খুন? সুকন্যা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—ইয়েস ম্যাডাম। সিচুয়েশান সেরকমই বলছে।

—তা কী করে হয়? ওর হাতে রিভলবার ধরা ছিল...!

—ওটাই তো খেলা। আপনার বান্ধবীকে গুলি করার পর কেউ একজন তার হাতে রিভলবারটা ধরিয়ে দিয়েছিল। নিখুঁতভাবে পারেনি, বুড়ো আঙুলটা রেখেছে ট্রিগারে। ওই আঙুলে ট্রিগার টিপে আত্মহত্যা ইজ নেক্সট টু ইমপসিবল্।

—তা বটে। সুকন্যা মাথা দোলাচ্ছে,—কবজির ওপর তো কনট্রোল থাকবে না। গুলি অন্যদিকে চলে যাওয়ার চান্স খুব হাই।

—শুধু তাই নয়। আর একটা তথ্যও জানাই। অজেয়র হাসি ক্রমশ চওড়া। হাসতে হাসতেই মিতিনকে বলল,—আপনাকেও সারপ্রাইজ দেব বলে এতক্ষণ বলিনি, রিভলবারের গায়ে কিন্তু কোনও ফিংগার-প্রিন্ট নেই। যারা ছাপ তুলতে এসেছিল, তারাই আবিষ্কার করেছে। তার মানে তবে কী দাঁড়ায়?

—রিভলভার থেকে সযত্নে হাতের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছে।

—ইয়েস। কিলার হ্যাজ ডান ইট। শুধু তাই নয়, অ্যাশট্রে থেকেও ছাপ মুছে দেওয়া হয়েছে। বিছানা, বালিশ, টেবিল, চেয়ার, কোথ্থাও কোনও ফিংগার-প্রিন্ট নেই। এমনকী আলমারির হ্যান্ডেলটাও সাফসুফ।

পার্থ হাঁ হয়ে গেছে। অস্ফুটে বলল,—এ তো মহা ধুরন্ধর খুনী! লোকটাকে আপনি পাকড়াও করবেন কী করে?

—রাস্তা আছে। সিস্টেমেটিকালি এগোতে হবে। দেখতে হবে, তৃষ্ণাকে খুনের উদ্দেশ্যটা কী? এবং দুষ্কর্মটি কে করতে পারে?

—সাসপেক্ট তো আপাতত একজনই। যে লোকটা কাল সন্ধেয় তৃষ্ণার কাছে এসেছিল। বলেই পার্থ মাথা নাড়ছে,—যাহ্, তাই বা কী করে হয়? সে তো তৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে গেছে। ঘটনাটার আই-উইটনেস্‌ও আছে।

সুকন্যা বিস্মিত মুখে বলল,—কে এসেছিল কাল?

মিতিন বলল,—একজন বছর চল্লিশেকের লোক। ভুঁড়ি আছে, চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা...

—প্রশান্ত সেন নয় তো? সুকন্যা বিড়বিড় করে উঠল,—ড্রেসক্রিপশান তো ওর সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে।

—তুমি চেনো লোকটাকে?

—অবশ্যই। আমার প্রেজেন্সেই এক দুবার এসেছে।

—সে কেমন লোক?

—অ্যাপারেন্টলি খুবই ভদ্র। কিন্তু আমার মনে হত, কেন যেন সুবিধের নয়।

—মনে হওয়ার কারণ?

—লোকটা আমাকে ভীষণ অ্যাভয়েড করত। আর তৃষ্ণাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গুজগুজ করত কী সব। লোকটা চলে যাওয়ার পর তৃষ্ণাও খুব মনমরা হয়ে থাকত।

—তুমি তৃষ্ণার কাছে জানতে চাওনি লোকটা কে?

—তৃষ্ণা সেভাবে খুলে বলেনি কখনও। কেমন যেন ভাসা ভাসা উত্তর দিত।

—কী রকম?

—লোকটা নাকি ওর ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভ। একসময়ে বহরমপুরে থাকত, এখন কলকাতায় বসবাস করছে...। সম্ভবত তৃষ্ণার কাছ থেকে টাকাপয়সাও নিত মাঝে মাঝে।

—সম্ভবত কেন বলছ?

—লোকটা যাওয়ার পরেই দেখতাম তৃষ্ণা ব্যাঙ্কের পাশবই ঘাঁটছে। তা ছাড়া ...এই কিছুদিন আগেই আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নিল। অথচ তৃষ্ণা যা ইনকাম করে তাতে তো এভাবে তার টাকার অভাব হওয়ার কথা নয়। কক্ষনো ও ল্যাভিশ্‌লি খরচা করত না। টাকাটা দেওয়ার পর আমি লক্ষ করেছি, ও কিন্তু দামি কিছু কেনাকাটা করেনি।

—মামার বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে। হয়তো তাদের হঠাৎ কোনও প্রয়োজন হয়েছিল।

—নেক্সট্ টু ইম্‌পসিবল্। মামাদের নাম পর্যন্ত ও করত না।

—মামার বাড়ির সঙ্গে রিলেশান তেতো হওয়ার কারণ কী বলতে পারো?

—সঠিক জানি না। তবে মনে হয় বহরমপুরে ওর পাস্ট নিয়ে কিছু একটা প্রবলেম আছে। তার জন্যও সম্পর্ক খারাপ হয়ে থাকতে পারে। মামারা যে ওর সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে, তেমন অবশ্য শুনিনি। তৃষ্ণাই বলত, ওর বাবা একটা মাড়োয়ারি কোম্পানিতে সাধারণ চাকরি করতেন। থাকতেন জিয়াগঞ্জে। খুবই সাধারণ পরিবেশে। বাবার একটা স্কুটার ছিল, লরির সঙ্গে কলিশানে বাবা-মা দু'জনেই একসঙ্গে মারা যান। সুতরাং তৃষ্ণার তো পৈত্রিক সম্পত্তিরও প্রশ্ন ওঠে না।

—অতএব একটা ব্যাপারই পড়ে থাকে। অজেয় গলা ঝাড়ল,—আমার ধারণা, প্রশান্ত সেনই খুনের ঘটনাটার সঙ্গে জড়িত।

সুকন্যা ঠোঁটে ঠোঁট চাপল,—হতে পারে। হতেই পারে।

অজেয়র কপালের ভাঁজ বাড়ল,—লোকটা কি তবে ব্ল্যাকমেলার?

পার্থ ঘাড় নাড়ল,—এটা একটা সম্ভাবনা বটে। তৃষ্ণা তো কালই এ-টি-এম থেকে পনেরো হাজার টাকা তুলেছিল। এবং সেই টাকাটা তো পাওয়া যাচ্ছে না। ডেফিনিটলি ওই লোকটাকেই টাকা দিয়েছে।

এতক্ষণ পর মিতিনের মুখে অল্প হাসি ফুটেছে,—একটা কথা কিন্তু ভুলে যাচ্ছ। সোনার হাঁসের কেউ পেট চেরে? ব্ল্যাকমেলারকেই লোকে খুন করে। ব্ল্যাকমেলার কখনও টার্গেটকে হিট করে না।

—হুঁ, এটাও তো ঠিক। পার্থ মাথা চুলকোচ্ছে,—যাহ্, সব গুলিয়ে গেল।

পার্থ-মিতিনের কথার মাঝেই পকেট থেকে তৃষ্ণার মোবাইলখানা বের করে ফেলেছে অজেয়। বোতাম টিপে টিপে কল-লিস্ট দেখছে। সহসাই চোখ উজ্জ্বল,—এই তো...প্রশান্ত সেন পেয়েছি। পরশু সন্ধে ছটা একুশে

ফোন করেছিল, ফের কাল সকাল এগারোটা দশে, আবার বিকেল চারটে ষোলোয়। ...খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।

—কী রকম?

—প্রথমবারে টাকার কথা পাড়ল। দ্বিতীয় ফোনে মনে করিয়ে দিল। আর শেষে জানাল, ম্যায় আ রহা হুঁ।

মিতিনের তবু মন খুঁতখুঁত,—কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কটা তো খুঁজতে হবে। হোয়াই ব্ল্যাকমেলিং? তা ছাড়া আবারও বলছি, সে যদি ব্ল্যাকমেলার হয়ও, টাকা পেয়ে গেলে সে খুন করবেই বা কেন?

—প্লাস, তৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছে। পার্থ ঢক ঢক ঘাড় নাড়ছে, —এটাও অলরেডি প্রুভড।

অজেয়র যেন পছন্দ হল না যুক্তিগুলো। গুম হয়ে গেছে।

হঠাৎই সুকন্যা বলে উঠল,—আমি একটা কথা বলতে পারি?

—কী?

—তৃষ্ণা ছিল বড্ড নার্ভাস প্রকৃতির মেয়ে। ওকে ভয় দেখানো ভীষণ সোজা। কারণটা ঠিক বলতে পারব না, তবে ব্ল্যাকমেলারদের কাছে তৃষ্ণা কিন্তু খুবই সফ্‌ট টারগেট। হয়তো ওই প্রশান্ত সেন লোকটা এমন কিছু জানত, যা প্রকাশ হয়ে গেলে তৃষ্ণার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

—কী ধরনের ক্ষতি?

—কে জানে, হয়তো বিয়েটা ভেঙে গেল। বিয়ে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখত কি না তৃষ্ণা। বিশেষ করে কৌশিকের ওপর তো ওর একটা অন্ধ দুর্বলতা ছিল। প্রশান্ত সেন হয়তো সেটাই ক্যাশ করতে চেয়েছিল। রেগুলার টাকা ছিনিয়ে নিত তৃষ্ণার কাছ থেকে।

মিতিন বলল,—ফের সেই একই গাড্ডায় কিন্তু ঢুকে পড়ছি আমরা। হাঁস আর সোনার ডিমের গল্প।

সুকন্যা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল,—তাহলে আর কী হতে পারে বলুন?

—ভাবতে হবে। মিতিন চিন্তিত মুখে বলল,—আচ্ছা মিস্টার সিন্‌হা, কাল কি কৌশিকের সঙ্গে তৃষ্ণার যোগাযোগ হয়েছিল? কললিস্ট কী বলছে?

—হ্যাঁ, কৌশিকও তো কাল ফোন করেছিল। না, না, কাল নয়, পরশু। পাঁচটা ছাব্বিশে। অজেয় ফের মোবাইলের বোতাম টিপছে,—একশো বাইশ সেকেন্ড কথাবার্তা চলেছিল। কাল কয়েকটা মিস্‌ড কল রয়েছে পর পর। সন্ধে সাতটা তিন, সাতটা পাঁচ, সাতটা নয়...। আবার রাত্তিরে। এগারোটা আঠাশ।

—সব মিস্ড কলই কৌশিকের?

—তাই তো দেখছি। একটা এস-এম-এসও আছে।...হোয়াটস্ রং? স্লিপিং সো আর্লি?...মেসেজটা এসেছে রাত এগারোটা একত্রিশে।

মিতিন বলল,—আজ কৌশিক এখনও একবারও ফোন করেনি, না?

—হয়তো অভিমান হয়েছে। তৃষ্ণার কাছ থেকে কোনও সাড়া পায়নি তো। অজেয় সশব্দে চেয়ার ছাড়ল,—পুওর চ্যাপ। বিয়ের দেড় দু'মাস আগে হবু বউ বেঘোরে মরল...খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বলতে বলতে হাতের মুঠো পাকাচ্ছে,—নাহ্, প্রশান্ত সেনকে ছাড়া নেই। ব্যাটাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব।

—দাঁড়ান। আগে প্রমাণ-টমানগুলো জোগাড় হোক।

—প্রমাণ না থাকাটাই ওর এগেন্স্টে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে ম্যাডাম। পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে অজেয়। যেতে যেতে সুকন্যাকে বলল, —আপনাদের অফিসে সংবাদটা জানালেন? নাকি আমি জানাব।

—বসকে রিং করেছি। সুকন্যা আবার অনেকটাই স্বচ্ছন্দ, —বস তো শুনে হায় হায় করছেন। তৃষ্ণা কাজে ভীষণ সিন্সিয়ার ছিল তো। উনি জিজ্ঞেস করছিলেন, কোনও সাহায্যে আসতে পারেন কিনা।

—আর কৌশিককে?

—ওটা আমার দ্বারা হবে না। প্লিজ, আপনারা জানিয়ে দিন।

মিতিনও উঠে পড়েছিল। সুকন্যার কাঁধে হাত রেখে বলল,—তুমি এই ফ্ল্যাটে এখন একা থাকতে পারবে তো?

—পারব। এবার থেকে তো একা থাকাই অভ্যেস করতে হবে।

স্বরটা যতটা ভিজে, তার চেয়ে যেন অনেক বেশি হুতাশ। এমনটাই মনে হল মিতিনের। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল একটু। তারপর কী ভেবে যেন গেছে রান্নার জায়গাটায়। চোখ বোলাচ্ছে বাসনপত্রে, রান্নার গ্যাসে, মাইক্রোওভেনে। স্টোভের আশপাশে হাত বোলালো কয়েক সেকেন্ড। দেখল করতল। তারপর হাত ধুতে গেছে সিংকে। স্যান্ডুইচসমেত প্লেট নামানো আছে সিংকে। থালাটা তুলে পর্যবেক্ষণ করল একটু। আবার নামিয়ে রেখেছে।

অজেয় ডাইনিংটেবিলের সামনে থেকে ঠাট্টা ছুড়ল,—বিশেষ কোনও সূত্র খুঁজছেন নাকি?

—না। ছাই ওড়াচ্ছি। পরশপাথরের সন্ধানে। মিতিন মুচকি হাসল, —মেয়েদুটোর ঘরসংসারও দেখছিলাম।

—বাড়ি যাবেন তো এখন?

—যদি আপনার কৃপা হয়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। পুলিশের গাড়ি আবাসনের গেটে দাঁড়িয়ে। কিছু এলোমেলো মানুষও। অজেয় আর পার্থ উঠে গেল জিপে। মিতিনও পা-দানিতে পা রেখেছিল। হঠাৎই বলল—এক মিনিট। আমি একটু সুশীলের সঙ্গে কথা বলে আসি।

ছয়

বুমবুমের সকালে স্কুল। ছ'টার মধ্যে উঠতে হয় বুমবুমকে। তাড়াতাড়ি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে লিভিংরুমে এল মিতিন। এবার নিশ্চিন্তে নৈশাহার সারবে কর্তাগিন্নি।

রাতের রুটি করে গেছে আরতি। এখন মুরগির মাংস আর ওবেলার বাঁধাকপিটা আর একবার গরম করলেই খানা তৈয়ার। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে পাত্রগুলো ঢোকাল মিতিন। টেবিলে প্লেট সাজাচ্ছে।

পার্থ শাল মুড়ি দিয়ে টিভির সামনে। পরদায় খেলার চ্যানেল। ভলিউম কমানো। পার্থর চোখ স্প্যানিশ লিগ ফুটবলে, কানে মোবাইল। বাক্যালাপ শেষ করে আপনমনে হেসে উঠল। গলা উঁচিয়ে বলল,—ওফ্, তমালটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

মিতিন হাসতে হাসতে বলল,—এখনও কাঁপছে বুঝি?

—শুধু কাঁপুনি নয়, ভিরমি খাচ্ছে। এমন আপসেট হয়ে পড়েছে যে গলা দিয়ে জল পর্যন্ত নামছে না।

—স্বাতীকে বলো এক দু পেগ হুইস্কি খাইয়ে দিতে। নার্ভটা স্টেডি হবে।

—লাভ নেই। তমাল যা টাইপ, নির্ঘাত বমি করে দেবে। পার্থ টিভি অফ করে সোফা ছেড়ে উঠল। ডাইনিং টেবিলে এসে বলল,—বেচারার মুখে এখন এক বুলি। গোখ্‌খুরি হয়ে গেছে...দরকার হলে ফ্ল্যাট বেচে দেব...কিন্তু পিজি-ফিজি আর রাখছি না!

—স্বাভাবিক। গেরস্ত মানুষের কি এইসব অশান্তি সহ্য হয়?

—ব্যাটা আরও ভয় পাচ্ছে কেন জানো? দারোগা সাহেব এমন চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করছিলেন...ও ব্যাটা ধরেই নিয়েছে পুলিশের চোখে ও এখনও সাসপেক্ট।

—ভুল কিছু ভাবেনি। সন্দেহের তালিকায় তমালদা তো আছেই। কাল সে ওই বাড়ি গিয়েছিল। মেয়েটার সঙ্গে এগজ্যাক্টলি কী কথা হয়েছে নো ওয়ান নোজ্।

—যাহ্, তমাল খুব ভালমানুষ। তা ছাড়া মৃত্যুটা হয়েছে ইভনিংয়ে, তখন তমাল কোথায়?

—সেটা তমালদাকেই প্রমাণ করতে হবে। ভুলে যেও না, তমালদাই এমন একজন লোক, যার কাছে আর একসেট চাবি থাকে। এবং ইচ্ছে করলেই ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারে। সুতরাং তার নিশ্ছিদ্র অ্যালিবাই থাকা দরকার।

—তা তো লাগবেই। পার্থ ক্যাসারোল খুলে রুটি নিল। একটু বাঁধাকপি মুখে পুরে বলল,—তমাল একটা পরামর্শও চাইছিল।

—কী?

—সুকন্যাকে এক্ষুনি ফ্ল্যাট ছাড়তে বলা কি ঠিক হবে?

—তাড়াহুড়োর কী আছে! মেয়েটা হয়তো এমনিই...

—আই ডাউট। যে মেয়ে এমন একটা ঘটনার পরেও অবলীলায় ফ্ল্যাটে একা একা থাকতে পারে, সে পরে কী করবে বলা কঠিন। পার্থ খাওয়া থামিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল,—আচ্ছা, মেয়েটাও নিশ্চয়ই তোমাদের চোখে সাসপেক্ট?

—অবশ্যই। আফটার অল রিভলবারটা ওরই। এবং যে কোনও সময়েই ওর ফ্ল্যাটে ঢোকার সুযোগ আছে।

—কিন্তু সুকন্যা তো গতকাল আসানসোলে! ও কি ওখান থেকে রিমোটে রিভলবার চালিয়েছে?

—সুকন্যা আদৌ আসানসোলে গিয়েছিল কি না তাও তো প্রমাণ সাপেক্ষ। আমি সুশীলকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, আজ দুপুর বারোটা, সাড়ে বারোটার সময়ে সুশীল নীচে ছিল না। বাজারে গিয়েছিল। সুকন্যা ওই সময়েই ফিরেছে কি না সেটা সুশীলের নজরে নেই।

—তো?

—এমনও হতে পারে, মেয়েটা কাল আসানসোল না গিয়ে অন্য কোথাও ছিল। কলকাতাতেই। তারপর সন্ধে সাতটা, আটটার সময়ে চুপচাপ এসে ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছে। সুশীল কাল সন্ধের পর থেকে নিজের ঘরে বসে টিভি দেখছিল, সুতরাং কারোর আসা যাওয়া তার নোটিসে না আসাই স্বাভাবিক।

—অর্থাৎ সুকন্যা ফ্ল্যাটে ঢুকে, দুষ্কর্মটি করে, সারারাত নিঃসাড়ে নিজের ঘরে রয়ে গেল? সকালটাও কাটিয়ে দিয়ে দুপুরবেলা হাঁকডাক করে লোক জড়ো করল?

—একদমই ইমপসিবল্ কী? বিশেষত সুকন্যার নার্ভ যা শক্ত...

—তবু মোটিভটা কী? বন্ধুকে মেরে ফেলার? ওই পনেরো হাজার টাকা?

—উঁহু, আক্রোশ। ত্রিকোণ প্রেমে হেরে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা।

—কৌশিকের ওপর সুকন্যারও দুর্বলতা ছিল বলছ? অথচ হাবেভাবে তো মনে হচ্ছিল ছেলেটাকে পছন্দ করে না...

—হয়তো ওটা ভান। আমরা এখনও সঠিক কিছুই জানি না পার্থ। মিতিন মুচকি হাসল,—এবং এ-ও জানি না, সন্ধে সওয়া সাতটায় কৌশিক কেন পর পর তিনবার তৃষ্ণাকে কল করেছিল।

—তৃষ্ণার সঙ্গে হয়তো যোগাযোগের চেষ্টা করছিল, পাচ্ছিল না।

—আমার কিন্তু একটু স্ট্রেঞ্জ লাগছে। যদি না কৌশিক...

মিতিন কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। পার্থ উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল,—কৌশিক কী?

—কিছু না। একটা সংশয় ঘুরছে মাথায়।

—যাই বলো, আমার বুদ্ধি বলছে সুকন্যা বা কৌশিক এর মধ্যে জড়িত নয়। পার্থ একঢোক জল খেল,—আমি অজেয়বাবুর সাইডে। সত্যিই যদি তৃষ্ণাকে কেউ খুন করে থাকে, তাহলে সে হল প্রশান্ত সেন। নির্ঘাত লোকটা চলে গিয়েও আবার ঘুরে এসেছিল।

—এই সম্ভাবনাকে আমিও কিন্তু উড়িয়ে দিইনি। মিতিন মুরগির হাড় চিবোচ্ছে,—সত্যি বলতে কী, এই চান্সটাই সব চেয়ে বেশি প্রোব্যাবল্। প্রশান্ত এই কেসে প্রাইম সন্দেহজনক ক্যারেক্টার। লোকটা আসলে কে, তৃষ্ণার সঙ্গে তার কী ধরনের সম্পর্ক, কেনই বা সে তৃষ্ণার কাছে আসত—সবটাই বেশ ধোঁয়া ধোঁয়া।

—এবং পনেরো হাজার টাকাটা সেই পকেটস্থ করেছে। এটা তো একেবারে জলবৎ তরলং।

—দেখা যাক, কৌশিক, প্রশান্ত, দুই মক্কেলকেই তো চেজ করা হচ্ছে। মিতিন পার্থর প্লেটে আর এক টুকরো চিকেন তুলে দিল,—গবেষণা রেখে আগে খাওয়াটা সারো। টেবিল পরিষ্কার করে আমি একটু কাজে বসব।

—এখন কী কাজ?

—আছে। থট প্রসেসিং।

পরদিন সকাল ন'টায় অজেয়র ফোন,—কী ম্যাডাম, খুব ব্যস্ত নাকি?

ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড় ঢোকাচ্ছিল মিতিন। কৌতুকের সুরে বলল, —কই আর! আপনারা পুলিশরাই তো সব কেস সল্ভ করে ফেলছেন, আমাদের আর কাজ কোথায়!

—টিজ করছেন না তো? অজেয় হা-হা হাসল,—ফাঁকা থাকলে চলে আসুন না থানায়।

—কেন?

—কৌশিক রায়কে ডেকে পাঠিয়েছি। এগারোটায়। প্রেমিকটিকে একবার স্বচক্ষে দেখে যান।

—ছেলেটাকে কখন ডেথ নিউজটা দিলেন?

—কাল। থানায় ফিরেই। শুনে প্রথমটা এমন হাউমাউ করে উঠল...। অবশ্য সামলেও নিল পরে। আমি কিন্তু খুনের সন্দেহটা ভাঙিনি। বলেছি, সম্ভবত আত্মহত্যা।

—হঠাৎ কৌশিককে নিয়ে পড়লেন যে বড়? আপনার টার্গেট তো প্রশান্ত?

—ধাপে ধাপে এগোতে হবে তো। বাই মেথড অফ এলিমিনেশান।

—প্রশান্তকে কোনও কলই করেননি?

—এখনও পর্যন্ত না। একটু রিল্যাক্সড থাকতে দিচ্ছি। ওতেই গ্রিপে আনতে সুবিধে হবে।...এনিওয়ে, সুকন্যার অ্যালিবাই কিন্তু আমি চেক করে নিয়েছি। শনিবার পুরো দিনটাই ও আসানসোলে ছিল। তবে বাবাটাকে দাবড়েছি এক প্রস্থ। মেয়ের হাতে রিভলবার ছেড়ে দেয়, এ কেমন আক্কেল! বলেছি, এর জন্য মেয়েকে ভুগতে হবে এবং আপনাকেও। ভদ্রলোক তো বললেন আজই মেয়ের কাছে কলকাতায় চলে আসছেন।

—পি-এম আজ হচ্ছে তো?

—শিওর। বডি চলে গেছে কাঁটাপুকুরে। শুক্র-শনিবারের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে যাব।

—খুব একটা কাজে লাগবে কি রিপোর্টটা? মোড অফ ডেথ নিয়ে তো কোনও সংশয় নেই।

—তবু দেখে তো একবার নিতেই হবে। আর ব্যালিস্টিক রিপোর্টটাও দরকার।

—হ্যাঁ, ওটা বরং অনেক বেশি জরুরি। গুলি যে ওই রিভলবার থেকেই বেরিয়েছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে কেসটাই তো গুবলেট।

—আরে দূর, ওরকম কোনও চান্সই নেই। চলে আসুন, প্লিজ।

পার্থ কান খাড়া করে শুনছিল কথাগুলো। মিতিন ফোন ছাড়তেই তার চোখ জ্বলজ্বল,—কী গো, আমিও যাব নাকি?

মিতিন হিহি হাসল,—এ যে দেখি বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে! তোমার প্রেসে যাওয়ার কী হবে?

—ওখান থেকেই চলে যাব। একদিন দেরিতে গেলে কারবার ডকে উঠবে না।

—তাহলে আর কী। চলো অকাজে।

আকাশে আজ অল্প অল্প মেঘ। রোদ্দুর নেই, অথচ ঠান্ডাটা যেন কমে গেছে ঝপ করে। কলকাতায় শীত বোধহয় এবার ফুরিয়ে এল। কিংবা ছোটখাটো বৃষ্টির পর আবার নামবে পূর্ণোদ্যমে।

থানায় এসে মিতিন দেখল কৌশিক ইতিমধ্যেই হাজির। থমথমে মুখে বসে অজেয়র চেম্বারে। পরনে জিন্স, ফুলশার্ট, আর হাফস্লিভ সোয়েটার। দেখতে মোটামুটি রূপবান। কায়দা করে কাটা চুল কপালে ঝাঁপিয়ে এসেছে। কব্জিতে দামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি। তর্জনী আর অনামিকায় আংটি। মুক্তো আর প্রবাল বসানো। মুঠোয় মহার্ঘ মোবাইল।

মিতিনদের দেখে চা আনাল অজেয়। কৌশিকের জন্যও এসেছিল চা, তবে সে খেল না। প্রত্যাখ্যান করল সবিনয়ে। মলিন মুখে বলল,—আই অ্যাম নট ফিলিং টু টেক এনিথিং।

কাপে চুমুক দিয়ে অজেয় বলল,—ও-কে। তাহলে কাজের কথা শুরু করা যাক।...বুঝতেই পারছেন, আপনাকে এখন কয়েকটা অপ্রিয় প্রশ্ন করব আমরা।

—কী প্রশ্ন?

নাম-ধাম, চাকরি-বাকরি সম্পর্কে নতুন করে জেনে নিয়ে অজেয় মূল প্রসঙ্গে এল,—তৃষ্ণার সঙ্গে আপনার ঠিক কদ্দিনের আলাপ?

—মাস ছয়েক। উই ফার্স্ট মেট অ্যাট ব্লু হেভেন।

—সেদিন তৃষ্ণার সঙ্গে সুকন্যাও তো ছিল?

—ছিল।

—সম্পর্কটা তো আপনাদের যথেষ্ট গভীর হয়েছিল, নয় কি?

—ফেব্রুয়ারির মিড্‌লে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান অফিসে আমাদের নোটিস দেওয়ার কথা।

—আপনারা কি রেগুলার মিট করতেন?

—রোজ নয়। উইকে এক-দু-দিন। বেশিরভাগ ফোনেই কথা হত।

—লাস্ট কবে দেখা করেছেন?

—কাল সান্‌ডের আগের সান্‌ডে। দুপুরে ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম।

—শনিবার তো তৃষ্ণার ছুটি থাকে। মিতিন ফস করে বলে বসল,—এই শনিবার তৃষ্ণার সঙ্গে কোনও প্রোগ্রাম করেননি?

—না মানে...। কৌশিক যেন এবার বেশ অসহজ, —অফিসে একটা আরজেন্ট কাজে ফেঁসে গিয়েছিলাম...তৃষ্ণাকে আমি বলেওছিলাম...

অজেয় বলল,—আপনি তৃষ্ণাকে লাস্ট কল করেছিলেন পরশু রাত্রে। একটা এস-এম-এসও পাঠিয়েছিলেন। অথচ তার পর থেকে আপনার আর কোনও কল নেই। কেন? আপনাদের কি কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?

—না তো।...আমি আশা করেছিলাম ও আমায় রিং করবে।

—কাল সারাদিন ওর ফোন না পেয়ে আপনি অবাক হননি?

—অ্যাকচুয়ালি অতটা ভাবার সময় পাইনি। বাড়িতে লোকজন এসেছিল, তাদের নিয়ে একটু বিজি ছিলাম...

—তাই কি? মিতিন ফের নাক গলাল,—নাকি আপনি জেনে গিয়েছিলেন সে আর নেই?

—কী করে জানব? কৌশিক ঈষৎ চঞ্চল,—কোথ্‌থেকে জানব?

মিতিন নিরীহ মুখে বলল,—শনিবার বিকেল থেকে আপনি কী কী করেছেন যদি একটু খুলে বলেন...মানে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত?

—এ প্রশ্ন আমায় করার অর্থ কী? আমি জবাব দেবই বা কেন?

—দিলে আপনারই ভাল। ইউ মে কাম ক্লিন।

—মানে? আপনাদের কি ধারণা আমি তৃষ্ণার মৃত্যুর জন্য রেসপন্সিবল্‌?

—হতেও তো পারেন। আচমকাই মিতিনের চোয়াল শক্ত,—আমি কিন্তু জানি পরশু সন্ধেবেলা আপনি তৃষ্ণার কাছে এসেছিলেন।

—কী যা তা বলছেন! আমি সেদিন আটটা অব্দি অফিসে...

—ঠিক বলছেন না। আপনি যে এসেছিলেন তার প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু আছে। ওই হাউজিংয়ের কেয়ারটেকার নিজের ঘর থেকে দেখেছে।

—ইমপসিবল্। তার ঘর বন্ধ...। উত্তেজনার ঝোঁকে বলে ফেলেই কৌশিক মুখ ঢাকল দু'হাতে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে জোরে জোরে।

অজেয় বিস্মিত চোখে মিতিনকে দেখছিল। মিতিন মৃদু হাসল। নরম গলায় কৌশিককে বলল,—এবার নিশ্চয়ই আর খোলাখুলি বলতে আপত্তি করবেন না?

আস্তে আস্তে মুখ তুলেছে কৌশিক। ভেঙে পড়া গলায় বলল,—বিলিভ মি, আমি তৃষ্ণার মৃত্যুর জন্য দায়ী নই। আমি কিছু জানি না।

—কিন্তু এসে তো ছিলেন? শনিবার সন্ধেবেলা?

—হ্যাঁ। আমি ওকে আগের দিন বলেছিলাম শনিবার দেখা করতে পারব না। তাতে তৃষ্ণা অফেন্‌ডেড হয়েছিল, সকাল থেকে আমায় একটাও ফোন করেনি। তাই কোনওক্রমে তাড়াতাড়ি অফিসের কাজ চুকিয়ে, তৃষ্ণাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য, সোজা ওর ফ্ল্যাটে চলে যাই। গিয়ে বেল বাজাই, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাইনি।

—তখন ক'টা বাজে?

—সাতটা পনেরো কুড়ি। প্রথমে ভাবলাম, সুকন্যা তো নেই, তৃষ্ণা হয়তো একা একা ফ্ল্যাটে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগানোর জন্য মোবাইলে ফোন করলাম। একবার নয়, তিন তিন বার। তারপরও যখন দরজা খুলল না, আমি শিওর হলাম ও বেরিয়ে গেছে। আমার তখন প্রচণ্ড রাগ হল। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আই ওয়াজ ডিজেক্টেড। মনে হচ্ছিল, এত পরিশ্রম করে সময় বার করলাম, অথচ সন্ধেটাকে এইভাবে নষ্ট করল তৃষ্ণা? কোথায় এমন গেছে সে, যে আমার ফোন পর্যন্ত ধরে না? নাকি মোবাইল ঘরে রেখেই বেরিয়ে পড়েছে?...বিরক্ত হয়েই আই লেফট হার প্লেস। পরে রাগ থিতিয়ে গেলে রাত্তিরে ওকে আবার ফোন করি। মেসেজও পাঠাই। বাট নো রিপ্লাই। কৌশিকের গলা সামান্য ধরে এল,—আমি তখন কী করে জানব তৃষ্ণা আর নেই!

—আর গতকাল? রোববার?

—অত বার ফোন করার পরেও যদি উত্তর না মেলে...! ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, কালও আমি ওর ওপর খুব চটে ছিলাম।

—বুঝলাম। মিতিন মাথা নাড়ছে,—আচ্ছা, তৃষ্ণা হঠাৎ কেন সুইসাইড করল, এ সম্পর্কে এনি আইডিয়া?

—জানি না। মাথাতেই ঢুকছে না। শুক্রবারও তো যখন মোবাইলে কথা বলেছে, শি ওয়াজ ফাইন।

অজেয় গলা ঝাড়ল,—প্রশান্ত সেন বলে কাউকে আপনি চেনেন?

পলকের জন্য থমকেছে কৌশিক। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, —হ্যাঁ, চিনি।

—কোথায় আলাপ হয়েছিল?

—আলাপ ঠিক বলা যায় না। আই মেট হিম ওয়ান্স।

—কী করে?

—পুজোর পর...দেওয়ালির আগে একদিন আমি আর তৃষ্ণা এলগিন রোডের এক কফিবারে বসে ছিলাম। লোকটাও সেখানে ছিল। হঠাৎ এসে তৃষ্ণার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। তৃষ্ণার অফিস কেমন চলছে...এখন মামার বাড়ি যাচ্ছে কিনা...তৃষ্ণার মামাতো ভাইরা কে কেমন আছে...। আমার সঙ্গে কোনও পরিচয়ই নেই, অথচ আমার সঙ্গেও গায়ে পড়ে কথা বলতে শুরু করল। তৃষ্ণা তখন বাধ্য হয়ে ইন্ট্রোডিউস করে দিল আমাকে।

—লোকটাকে আপনার কেমন লেগেছিল?

—অসহ্য। আনকালচারড্ টাইপ। ম্যানারস জানে না, প্রিভেসিতে ইনট্রুড করে...। বলেওছিলাম তৃষ্ণাকে, এই ধরনের লোকের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকে কী করে! শুনে ওর মুখ শুকিয়ে এতটুকু। বলেছিল, ওই প্রশান্ত সেন নাকি ওদের বহরমপুরের লোক...কেমন যেন দূরসম্পর্কের দাদা...ওর সঙ্গে নাকি এককালে লাইন মারার চেষ্টা করত খুব...তৃষ্ণা আদৌ পাত্তা দেয়নি বলে ইচ্ছে করে নাকি রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে ইন্টিমেসির ভাব দেখায়।

—প্রশান্ত সেন কিন্তু মাঝে মাঝেই তৃষ্ণার ফ্ল্যাটে আসত।

—ইজ ইট? কৌশিকের চোখে ঘোর বিস্ময়, —তৃষ্ণা তো কখনও বলেনি!

—সুকন্যার মুখেও শোনেননি?

—সুকন্যার সঙ্গে আমার খুব একটা ফ্রেন্ডশিপ নেই। উই হ্যাভ এক্সট্রিমলি ফরমাল রিলেশান।

—কেন?

—ও বড্ড নাক উঁচু মেয়ে। আমার আর তৃষ্ণার অ্যাফেয়ারটা ওর চোখে ন্যাকামি।

—সুকন্যা কি পুরুষবিদ্বেষী?

—মে বি। মে নট বি। আমি বলতে পারব না।

—তৃষ্ণাকে কখনও জিজ্ঞেস করেননি?

—সুকন্যার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই।

—আর একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে। মিতিন সামান্য ঝুঁকল, —তৃষ্ণা বা সুকন্যার মধ্যে কেউ কি স্মোকার?

—সুকন্যা বোধহয় অল্পস্বল্প স্মোক করে। তৃষ্ণা...কখনওই না।

—আর আপনি?

—খাই।

—বাঁধা ব্র্যান্ড আছে কোনও?

—ইন্ডিয়ান ক্লাসিক। কৌশিককে রীতিমতো অসহিষ্ণু দেখাল আবার, —আমার সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে তৃষ্ণার সুইসাইডের কী সম্পর্ক?

—কারণ তৃষ্ণা যে আত্মহত্যাই করেছে, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। মিতিন পার্থকে ঝলক দেখে অজেয় ঘোষণার সুরে বলল,—মার্ডার হলে খুনীকে তো খুঁজে বার করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ইনফরমেশানই জরুরি।

কৌশিকের মুখ পাংশু। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—তৃষ্ণা খুন হয়েছে? কে করল খুন? কেন?

—সেটাই তো বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছি। অজেয়র স্বর আরও ভারিক্কি, —তৃষ্ণার অতীত সম্পর্কে আপনি কোনও ইনফরমেশান দিতে পারেন কি?

—যতদূর শুনেছি, চোদ্দো পনেরো বছর বয়সে ও পেরেন্ট্‌সদের হারিয়েছে। মামার বাড়িতে লাইফটা খুব সুখের ছিল না, শি হ্যাড টু স্ট্রাগল্ আ লট।

—আপনার বাড়ির লোকরা তৃষ্ণার কথা জানেন?

—শিওর। তৃষ্ণা আমাদের বাড়িতেও গেছে। আমার বাবা-মা ওকে খুব পছন্দ করতেন। ইনফ্যাক্ট, তৃষ্ণার মতো সাদাসরল, খোলা মনের মেয়েই তো চেয়েছিলেন তাঁরা। কৌশিক বিহ্বল মুখে মাথা নাড়ছে,—হঠাৎ যে কেন সব উলটেপালটে গেল...! আমি যে এখন কী করি...!

কৌশিকের কাতরতা দেখে সকলেই চুপ। কয়েক সেকেন্ড পর অজেয় বলল,—আপনি যেতে পারেন এখন। তবে বুঝতেই তো পারছেন, ইনভেস্টিগেশান চলছে। আমাকে না জানিয়ে ঝপ করে কোথাও যেন চলে যাবেন না।

কৌশিক নতমস্তকে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্থির চোখে ছেলেটাকে দেখছিল মিতিন।

সাত

সকালের মেঘ বৃষ্টি নামাল সন্ধের পর। জোরে নয়, ঝিরঝির ঝিরঝির। বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ তমাল এসে উপস্থিত। মুখচোখে বেশ বিধ্বস্ত ভাব।

পার্থ এখনও প্রেস থেকে ফেরেনি। মিতিন বসাল তমালকে। বলল,—এ কী, এমন ঝোড়ো কাকের মতো লাগছে কেন?

—ওফ্, যা ছোটাছুটি গেল সারাদিন! মর্গ থেকে তৃষ্ণার বডি বার করা... শ্মশান...দাহ কাজের বন্দোবস্ত...

—আপনি গিয়েছিলেন শ্মশানে?

—তাহলে আর বলছি কী! কেওড়াতলা থেকেই তো আসছি। তমাল সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে,—কার দায় কে সামলায়!

—কেন? তৃষ্ণার মামা আসেনি?

—না এলেই বোধহয় ভাল হত। সে তো গুড ফর নাথিং। তমালের স্বরে বিরক্তি,—কাজের কাজ একটাই করেছে। থানা থেকে আমার ফোন নাম্বারটা জোগাড় করে নিয়েছিল। তারপর স্ট্রেট আমার কাঁধে চেপে বসল।...এখানে তো আমাদের আর কেউ নেই, প্লিজ আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন...। লোকটাকে না-ও করতে পারছি না। পুলিশ যদি শোনে ননকোঅপারেশান করছি, তার আবার কী মানে বার করে কে জানে!

—অতএব আপনিও গাড্ডায়। মিতিন হেসে ফেলল,—যাক গে। বসুন, চা আনি।

ধূমায়িত কাপ হাতে ফিরে মিতিন দেখল তমাল ইংরেজি খবরের কাগজটা দেখছে মন দিয়ে। হাল্কা স্বরে মিতিন জিজ্ঞেস করল,—কী পড়ছেন? তৃষ্ণার নিউজটা?

—হুঁ। দেখছি খুব শর্টে দিয়েছে। তমাল কাগজটা মুড়ে রেখে বলল, —বাংলা পেপারে এর থেকে ডিটেলে আছে। তবে কোথাওই হত্যা না আত্মহত্যা বলা হয়নি, জাস্ট রহস্যজনক বলে ছেড়ে দিয়েছে।

—তাই তো দেখলাম। মিতিন তমালকে কাপ-ডিশ বাড়িয়ে দিল, —শ্মশানে আর কে কে ছিল?

—দু'-চার জন। সুকন্যা, সুকন্যার বাবা, এক্স ফ্যাক্টরের দু-তিনটে স্টাফ। তমাল চায়ে চুমুক দিচ্ছে—সকলের সামনে আমি সুকন্যাকে বলে দিয়েছি, আর কোনও ঝুটঝামেলা চাই না ভাই, মানে মানে আমার ফ্ল্যাটটা খালি করে ফ্যালো।

—রাজি হয়েছে ছাড়তে?

—জানুয়ারি মাসটা টাইম চেয়েছে। ওর বাবা তো বলছিল, বেহালায় কে এক আত্মীয় আছে, আপাতত তার বাড়িতে গিয়ে থাকতে। সুকন্যার ইচ্ছে নয়। ধন্যি সাহস মেয়েটার!

—ভাল তো। এখনকার যুগে সাহসী মেয়েই তো দরকার। মিতিন আলতো হাসল,—তা তৃষ্ণার মামাটিকে কেমন দেখলেন?

—লোক খুব বদ মনে হল না। শ্মশানে তো বার বার চোখ মুছছিল। অনেক আক্ষেপও করছিল তৃষ্ণার জন্যে।

—কীসের আক্ষেপ?

—তৃষ্ণা নাকি আজীবন বোকাই রয়ে গেল...। নিজের ভুলে নিজেই ভুগল, অন্যদেরও কষ্ট দিল...

—কী ভুল?

—তা জিজ্ঞেস করিনি। কেন ফালতু খোঁচাব?

—হুম্।...মামা কি শ্মশান থেকেই ট্রেন ধরতে ছুটল?

—না। বলল, বাসে ফিরবে। এস্‌প্ল্যানেডে গেল।

—আর তৃষ্ণার সব মালপত্র?

—নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। গা করল না। তমাল সেন্টারটেবিলে কাপ রাখল। ভুরু কুঁচকে কী যেন চিন্তা করছে। হঠাৎই গলা নামিয়ে বলল, —একটা সত্যি কথা বলবে?

—কী?

—কেসটা আলটিমেটলি কী দাঁড়াচ্ছে? মার্ডার? না সুইসাইড?

—পুলিশ তো মার্ডারই মনে করছে।

—ও।...আর আমায় নিয়ে কী ভাবছে পুলিশ?

—কী কাণ্ড, এখনও আপনার টেনশান কাটেনি? মিতিন শব্দ করে হেসে উঠল,—শনিবার সন্ধেটা নিয়েই তো সমস্যা। তখন কী করছিলেন, কোথায় ছিলেন, সে ব্যাপারে আপনি ক্লিয়ার থাকলেই তো হল।

—আমি দুশো পারসেন্ট ক্লিয়ার। বিকেলে স্বাতীর বোন এল, সন্ধেবেলা তার বর...তারপর আমরা সবাই মিলে বাইরে চাইনিজ খেতে গেলাম...

—ব্যস্, এই তো যথেষ্ট।

—বলছ? কিন্তু অ্যাশট্রেতে ওই সিগারেটের টুকরোটা...

—তুৎ। ছাড়ুন তো। অন্য কথা বলুন।...স্বাতী বলছিল মার্চে নাকি আপনারা ব্যাংকক বেড়াতে যাচ্ছেন?

—প্ল্যান একটা আছে। হয়তো ঝুমঝুমির পরীক্ষার পর...

টুকটাক গল্প করে খানিক বাদে উঠল তমাল। তাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে মিতিন ফের বসেছে সোফায়। নিবিষ্ট মুখে ভাবছে কী যেন। আপন মনে হাতের আঙুল দেখছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। একটু পরে টেলিফোনটা টানল। ল্যান্ডলাইন থেকে কল করছে অজেয় সিন্‌হাকে। বার কয়েক রিং হওয়াব পর ওপারে অজেয়র গলা গমগম,—ইয়েস? অজেয় সিন্‌হা হিয়ার।

—আমি প্রজ্ঞাপারমিতা বলছিলাম।

—আরে বলুন ম্যাডাম, এনি নিউজ?

—খবর তো আপনার কাছে। আর এগোলেন?

—উঁহু। থেমে আছি। দম নিচ্ছি।

—প্রশান্ত সেনকে লোকেট করা গেল?

—ও তো হাতের মুঠোয়। মোবাইল নম্বর রয়েছে, এনি টাইম কল পাঠাতে পারি।

—কিন্তু সে তো কৌশিক রায় নয়। পুলিশের ডাক পেলে যদি সে উড়ে যায়...?

—এটা একটা ভাবার মতো বিষয় বটে। দুষ্কর্মটি যদি সে করেই থাকে, গা ঢাকা দেওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। অজেয় একটুক্ষণ নীরব। ফের স্বর ফুটেছে,—তাহলে কী করি বলুন তো? থ্রু মোবাইল কোম্পানি ঠিকানাটা ট্রেস করব?

—সেটাও মিসলিডিং হতে পারে কিন্তু। মোবাইলটা পুরনো হলে, অ্যাড্রেস মে বি ডিফারেন্ট। তাছাড়া সঠিক ঠিকানা পেলেও তাকে সেখানে পাওয়া যাবে কি না তার নিশ্চয়তা কী? বরং একটা কাজ করলে হয় না? নম্বরটা আমায় দিন, আমি অন্যভাবে যোগাযোগ করে নিচ্ছি। তৃষ্ণার বন্ধু টন্ধু হিসেবে...

—বেড়ে আইডিয়া তো। অজেয় হা হা হাসল,—মাথায় আপনার খেলেও বটে। সকালে কৌশিককে দিব্যি একটা গুল ঝেড়ে দিলেন, আর ওমনি গুঁতো খেয়ে বাবু গড়গড় করে সব উগরে দিল...

—কোনটা গুল? সুশীলকে দেখাটা?

—অফকোর্স। আমি জানি সুশীলের ঘর কাল বন্ধ ছিল।

—কিন্তু কৌশিকের আসাটা তো মিথ্যে নয়। ওটা তো আমি সাতটা

পনেরো থেকে সাতটা কুড়ির মধ্যে তিনটে মিস্‌ড কল দেখে আঁচ করে ফেলেছিলাম।

—এবং কায়দা করে তিরটা ছুঁড়েও দিয়েছেন!

—ওই আর কী। ইঁদুর বেড়াল খেলা।

প্রশান্ত সেনের নম্বর টুকে নিয়ে ফোন রাখল মিতিন। উঠে ঘরে পায়চারি শুরু করেছে। তার মধ্যেই একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল ছেলেকে। লক্ষ্মী হয়ে হোমটাস্ক করছে বুমবুম। সম্ভবত অঙ্ক। ঘরে গিয়ে তার পাশে বসল একটুক্ষণ। তারপর আবার লিভিংরুমে ফিরে রিসিভার তুলেছে। চিরকুটে লেখা নম্বরটা ডায়াল করল।

হ্যাঁ, বাজছে। হিন্দি ফিল্মের গান। লাইন পুরো হতে না হতেই ওপারে ঘড়ঘড়ে গলা,—হ্যালো? কে বলছেন?

মিতিন মোলায়েম সুরে বলল,—আপনি আমায় চিনবেন না। আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। তৃষ্ণার অফিসে কাজ করি।

—ও।...বলুন?

—আপনি নিশ্চয়ই দুঃসংবাদটা পেয়েছেন? তৃষ্ণা মারা গেছে...?

—সে কী? কবে? কখন? জানি না তো।

—শনিবার সন্ধেবেলা।

—তাই নাকি? প্রশান্তর স্বরে যেন চমক,—কী করে? কী হয়েছিল?

—আত্মহত্যা করেছে। আজকের কাগজেও তো আছে খবরটা। কাল পুলিশ টুলিশ এসেছিল। বোধহয় কোনও মেন্টাল ডিপ্রেশান থেকেই...। প্রশান্তকে প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে মিতিন একটানা বলে চলেছে,—যাক গে, যে জন্য আপনাকে ফোন করা। তৃষ্ণার রুমে আপনার নামে লেখা একটা সিল্‌ড খাম পাওয়া গেছে। সুকন্যা খুব ডিসটার্বড...আমাকেই বলল আপনাকে কথাটা জানিয়ে দিতে। আপনি কি ওর অফিসে এসে খামটা নিয়ে যাবেন? নাকি পাঠিয়ে দেব?

ও-প্রান্ত নিশ্চুপ। প্রায় আধ মিনিট পর স্বর ফুটেছে,—আমি তো এখনই যেতে পারব না। যদি... কাইন্ডলি পাঠিয়ে দেওয়ারই ব্যবস্থা করেন...। আচ্ছা, আমার মোবাইল নাম্বারটা পেলেন কোথ্‌থেকে?

—তৃষ্ণার সেলফোনেই তো ছিল।

—ও। আবার বুঝি একটু ভেবে নিল প্রশান্ত,—ঠিক আছে, আমার অ্যাড্রেস নোট করে নিন। সাত নম্বর মলঙ্গা লেন, কলকাতা তেরো।

—কখন পাওয়া যাবে আপনাকে?

—সকাল এগারোটা অব্দি থাকি। আপনারা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিন না।

—দেখি কী করা যায়।

রিসিভার ক্রেডলে রেখে স্থির বসে আছে মিতিন। ভুরুতে ভাঁজ। লোকটা কিছু সন্দেহ করল না তো? থাকবে তো কাল?

সাত নম্বর বাড়িটা মলঙ্গা লেন পোস্ট অফিসের কাছেই। একসময়ে সুদৃশ্য অট্টালিকাই ছিল, এখন নেহাতই জরাজীর্ণ দশা। পলেস্তারা খসা দেওয়াল, দরজা-জানলা ভাঙা ভাঙা, কার্নিশে অশ্বত্থ গাছ ডালপালা মেলেছে। অন্দরে বড়োসড়ো উঠোন আছে একখানা। আটফাটা। উঠোন ঘিরে সার সার ঘর। একসময়ে হয়তো কোনও ধনী বাবুর দাসদাসী, আশ্রিতদের আস্তানা ছিল। ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘরও। এখন প্যাকিংবাক্সের কারখানা, আদ্যিকালের খুদে প্রেস, ট্রাভেল কোম্পানি...। সব মিলিয়ে যেন এক মিনি কলকাতা।

একে তাকে জিজ্ঞেস করে মিলল প্রশান্তর সন্ধান। এক হিন্দিভাষী লোক দেখিয়ে দিল সেনবাবুর ডেরা। রেডিমেড জামাকাপড়ের মিনি গুদামের পিছনে একটাই জানলাওয়ালা ছোট্ট খুপরি। বেলা সাড়ে দশটাতেও সেখানে বেশ অন্ধকার অন্ধকার। অগোছাল ঘরটিতে একটি চেয়ার আর তক্তপোষ ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে সিগারেটের প্যাকেট। ইন্ডিয়ান ক্লাসিক।

প্রশান্ত বিছানায় শুয়ে এফ-এম রেডিও শুনছিল। মিতিনের আকস্মিক আবির্ভাবে ধড়মড়িয়ে উঠেছে। হতচকিত মুখে বলল,—আপনি?

—কাল ফোন করেছিলাম...। মিতিনের গলা সহজ,—ওই যে... খামটা দেওয়ার ছিল...

—ও হ্যাঁ। আপনিই প্রজ্ঞা.....?

—প্রজ্ঞাপারমিতা।

—আসুন, আসুন।

মিতিন অবশ্য আমন্ত্রণের অপেক্ষায় নেই, বসে পড়েছে চেয়ারে। ব্যাগ থেকে একখানা সাদা লেফাফা বার করে বাড়িয়ে দিল,—এই যে।

খামের ওপরে লেখা নামটা পড়ে পাশে রেখে দিল প্রশান্ত। বলল, —থ্যাঙ্ক ইউ। তবে এত কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না, আমি তো বলেছিলাম কুরিয়ারে...

—সব কাজ কি কুরিয়ারে হওয়া ভাল? মিতিনের চোখ সরু, আপনি খুললেন না খামটা?

—পরে দেখে নেব।

—সে কী কথা? তৃষ্ণা পৃথিবী ছাড়ার আগে আপনাকে কিছু লিখে রেখে গেছে... জানতে ইচ্ছে করছে না? ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

মিতিনের স্বরে এমন একটা কিছু ছিল, প্রশান্ত যেন গুটিয়ে গেল খানিকটা। কপাল কুঁচকে মিতিনকে দেখল কয়েক পল। তারপর কী ভেবে যেন খামটা ছিঁড়েছে। ভেতরের কাগজখানা খুলে দেখল উলটেপালটে। হতবাক মুখে বলল, —এ কী, এ তো সাদা কাগজ? এর কী অর্থ?

—এরকম অনেক কিছুরই অর্থ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না প্রশান্তবাবু। এতক্ষণে দৃশ্যে অজেয়র উদয়। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ঢুকে পড়েছে ঘরে। পরনে পুলিশের উর্দি নেই, সাদা পোশাক। তবে সোয়েটার, বুশশার্টের নীচে কোমরে গোঁজা রিভলবারের অস্তিত্ব দিব্যি টের পাওয়া যায়। ঠোঁটে একটা পুলিশি হাসি খেলিয়ে অজেয় বলল,—আর ওই সব অর্থ খুঁজতেই তো আমাদের আসা।

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে তক্তপোষ থেকে নেমেছে প্রশান্ত। চোখ বড় বড় করে বলল,—মানে?

—যেমন ধরুন, শনিবার সন্ধেবেলা আপনি কেন তৃষ্ণার কাছে গিয়েছিলেন, আর আপনি চলে আসার ঠিক পরেই বা তৃষ্ণাকে কেন মৃত পাওয়া গেল...

—সে কৈফিয়ত আপনাদের দেব নাকি? আপনি কোন হরিদাস পাল, অ্যাঁ?

—নামটা ভুল করলেন। আমি অজেয় সিন্‌হা। তৃষ্ণা যেখানে থাকত, আমি সেই এলাকার পুলিশ স্টেশনের চার্জে আছি।...আর ইনি একজন প্রখ্যাত গোয়েন্দা। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি।

গোলগাল মুখখানা কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেল মুহূর্তে। তোতলাতে তোতলাতে প্রশান্ত বলল,—আপনারা আমাকে কেন...?

—প্রশ্নটা তো উনি করেই ফেলেছেন। মিতিন শক্ত গলায় বলল, —শনিবার সন্ধেয় আপনি তৃষ্ণার কাছে গিয়েছিলেন কেন?

—সে সম্পর্কে আমার বোন। প্রশান্ত নিজেকে অনেকটা সামলেছে, —তার কাছে আমি যেতেই পারি।

—কী রকম বোন?

—মাসতুতো।

—আপন মাসতুতো?

—না। একটু দূরসম্পর্কের। মার আপন খুড়তুতো বোনের মেয়ে।

—তাহলে তো খুবই আপন! মিতিনের স্বরে ব্যঙ্গ,—আপনি তাই বুঝি প্রায়ই তৃষ্ণার কাছে যেতেন?

—কর্তব্য পালনের জন্য। মেয়েটা একা একা কলকাতায় আছে...

—বটে? অজেয় গলা খাঁকারি দিল,—আমরা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছি। আপনি যখনই তৃষ্ণার দেখভাল করতে যেতেন, তার ঠিক আগেই তৃষ্ণার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে মোটা টাকা খসে যেত। কখনও দশ হাজার, কখনও পনেরো, কখনও বিশ...

প্রশান্ত হাত উলটে বলল,—তার আমি কী জানি!

—উঁহু, জানতে তো হবেই। শনিবার দুপুরবেলা তৃষ্ণা পনেরো হাজার টাকা তুলেছিল এবং সেই টাকার কিন্তু কোনও হদিশ নেই। অজেয় ঝুঁকে তক্তপোষের তলায় উঁকি দিল,—নীচে একটা স্যুটকেস দেখছি। ওটা খুলে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করব কি? এ-টি-এম থেকে তোলা টাকা, নোটের নম্বরগুলো কিন্তু আমার কাছে আছে।

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন। ঢোক গিলে প্রশান্ত বলল,—হ্যাঁ, টাকাটা তৃষ্ণা সেদিন আমায় দিয়েছিল!

—এই তো, পথে আসছেন। মিতিন মুচকি হাসল,—এবার নেওয়ার কারণটা বলে ফেলুন।

—আমি ফিনান্‌শিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত। প্রশান্ত গলা ওঠাল, মানে মিউচুয়াল ফান্ড, শেয়ার-টেয়ার কেনাবেচা করি। তৃষ্ণা আমার মাধ্যমে মার্কেটে টাকা খাটাত।

—তৃষ্ণার ঘরে কিন্তু শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ডের কোনও কাগজ পাওয়া যায়নি।

—হয়তো অন্য কোথাও রেখেছে। ব্যাঙ্কের লকার-টকারে।

—বেড়ে গপ্পো ফাঁদছেন তো! ...যাক গে, এবার আসল কথায় আসুন। অজেয় কোমরে হাত রাখল,—শনিবার ক'টার সময়ে গিয়েছিলেন তৃষ্ণার কাছে?

—পাঁচটা, সওয়া পাঁচটা।

—কোথায় বসে আপনারা দু'জনে কথা বলছিলেন?

—ড্রয়িং স্পেসে।

বিছানা থেকে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকের প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে অজেয় ফের প্রশ্ন হানল,—সিগারেট টানতে টানতে আড্ডা মারছিলেন, তাই তো?

—দরকারি কথাও হচ্ছিল। টাকাটা কোথায় রাখব, না রাখব...

—তারপর কাজ সেরে একসময়ে বেরিয়ে এলেন?

—অবশ্যই। তখন বোধহয় ছটা-ফটা বাজে। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাও তো তখন আমায় দেখেছেন।

—বেরনোর সময়ে তৃষ্ণার সঙ্গে কোনও কথা হচ্ছিল কী?

—হ্যাঁ। বলছিলাম কী যেন...

—একটু মনে করার চেষ্টা করুন।

প্রশান্ত চুপ একটুক্ষণ। তারপর বলল,—হ্যাঁ... বলছিলাম, তাহলে ওই কথাই রইল...আবার দেখা হবে...ওই যাওয়ার আগে যে ধরনের কথাবার্তা চলে আর কী।

—উঁহু। আপনি বলেছিলেন...আমার যা বলার বলে দিলাম, এবার তুমি ভেবে দ্যাখো তুমি কী করবে...! মনে পড়ছে?

—হতেও পারে। অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি শব্দ মাথায় রাখা সম্ভব নয়।

—কী ব্যাপারে কথাটা বলছিলেন, সেটাও কি স্মরণে নেই?

—না। বলেই প্রশান্ত জোরে জোরে ঘাড় নাড়ছে, —হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ওকে বলছিলাম, মার্কেট আবার শিগ্‌গিরই ফল করবে, তার আগেই যেন দু-একটা শেয়ার বিক্রি করে দেয়। ও দোনামোনা করছিল, সেই প্রসঙ্গেই...

—অতি ধূর্ত মানুষ আপনি। সুন্দরভাবে পর পর যুক্তি সাজিয়ে ফেলছেন। অজেয়র স্বর ঈষৎ চড়েছে,—শুনুন, আপনাকে কয়েকটা ইনফরমেশান দিই। একটু আগে বললেন, ড্রয়িংরুমে বসে সিগারেট ফুঁকছিলেন, কিন্তু অ্যাশট্রেটি পাওয়া গেছে তৃষ্ণার ঘরে।

—তো?

—আপনি বিদায় নেওয়ার পরে তৃষ্ণাকে আর কেউ জীবিত অবস্থায় দেখেনি।

—আপনারাই তো বলছেন সে সুইসাইড করেছে!

—তা আত্মহত্যার আগে অ্যাশট্রেটি সে ঘরে নিয়ে গেল কেন? মরার আগে পোড়া সিগারেটের গন্ধ শুঁকতে?

—আমি কী করে জানব? তৃষ্ণার সঙ্গে কথা সেরে তো বেরিয়ে গেছি। তারপর আমি আর ওই ফ্ল্যাটের ধারকাছ মাড়াইনি। ওখান থেকে সেদিন সোজা অলিম্পিয়া বারে গিয়েছিলাম। সঙ্গে একজন বন্ধুও ছিল।

অলিম্পিয়ার বিলও আমার পকেটে আছে। দশটার আগে ওই বার ছেড়ে আমি বেরোইওনি। ইচ্ছে করলে ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

—অ্যালিবাই যে তৈরি রেখেছেন, এ সম্পর্কে আমার কোনও সন্দেহ নেই। অজেয় মাথা দোলাল,—কিন্তু খুনটা তো আপনিই করেছেন ভাই।

—এ কী হাস্যকর অভিযোগ? প্রশান্ত এবার যথেষ্ট বিচলিত,—আমি যখন তৃষ্ণার ফ্ল্যাট থেকে বেরোলাম, তখনও তো সে অ্যালাইভ। দরজায় দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার সঙ্গে যে লাস্ট কথা বলছিলাম, তার সাক্ষীও আছে।

—ওটাই তো হোক্স প্রশান্তবাবু। কিংবা বলা যায় আপনার সেরা চাল।

—আশ্চর্য, আমি মিথ্যে বলছি না। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা দেখেছে, তার ছেলেও দেখেছিল...

—তবে শুধু তারা আপনাকেই দেখেছে প্রশান্তবাবু। আপনারই ডায়ালগ শুনতে পেয়েছে। তৃষ্ণার নয়। অজেয় এবার বোম্ ফাটাল,—কারণ তৃষ্ণা তখন দরজার ওপারে ছিলই না।

—মানে?

—তৃষ্ণা তখন অলরেডি ডেড। আপনি তাকে মেরে ফেলেছেন। বাই এ রিভলবার। ওয়ান শট।

—হোয়াট নন্‌সেন্স! কী যা তা বলছেন? আমি রিভলবার কোথ্‌থেকে পাব?

—এবার তাহলে গোটাটা বলি। অজেয়র চোয়াল কঠিন পলকে,—যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। তৃষ্ণা বহরমপুরে থাকার সময়ে এমন একটা কিছু করেছিল, যা প্রকাশ্যে জানাজানি হওয়া খুব লজ্জার। এবং যার জন্য সম্ভবত বহরমপুরের সঙ্গে তৃষ্ণার সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে যায়। আর সেই খবরটা নিয়েই আপনি ব্যবসা শুরু করেন। আই মিন, ব্ল্যাকমেলিং। কৌশিককে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে। অ্যাম আই রাইট?

—বাজে কথা। একদম বাজে কথা।

—বাজে, কী ঠিক, সে তো প্রমাণ হয়ে যাবেই। অজেয় দাঁতে দাঁত ঘষল, —তৃষ্ণাও ভয়ে আপনাকে টাকা দিয়ে যেত। তবে সব কিছুরই তো একটা সীমা থাকে। সহ্যেরও সীমা আছে। সেই লিমিট পেরিয়ে গেলে ভীতু প্রাণীরাও ফোঁস করে ওঠে। তৃষ্ণারও হয়েছিল সেই দশা। শনিবার সন্ধেবেলা আপনি শুধু ওই পনেরো হাজার টাকা নিয়েই ক্ষান্ত হননি, আরও কিছু টাকার দাবি করেন। রাগে, ক্ষোভে, তৃষ্ণা অন্ধ হয়ে যায়। অগ্রপশ্চাৎ

বিবেচনা না করেই সে বন্ধুর ঘর থেকে রিভলবার এনে আপনাকে গুলি করতে যায়। তখন আপনি রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে, আপনার ব্ল্যাকমেলিং ধরা পড়ে যাচ্ছে এই আশঙ্কায়, ততক্ষণাৎ মেয়েটাকে মেরে ফেলেন। তারপর সযত্নে রিভলবার, অ্যাশট্রে, ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গা থেকে আপনার হাতের ছাপ মুছে, মারণাস্ত্রটি মেয়েটার হাতে গুঁজে দিয়ে, নিঃশব্দে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সেইসময় পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাটির মুখোমুখি পড়ে গিয়ে মোক্ষম চালটি চাললেন আপনি। যেন তৃষ্ণা ওপারে আছে, আর আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন একটা ভান করে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেলেন। মহিলার মনেও ধারণা থাকল, তৃষ্ণা তখনও বেঁচে।...একদম ঠিকঠাক বললাম তো মিস্টার ডার্টি ব্ল্যাকমেলার?

—আমি মোটেই তৃষ্ণাকে মারিনি। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমাকে...

এক পা, এক পা করে দেওয়ালের দিকে পিছোচ্ছে প্রশান্ত। দু'দিকে মাথা নাড়ছে ঘন ঘন। অজেয় কোমর থেকে রিভলবারটা বার করে তার সামনে ধরল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট প্রশান্ত সেন।

আট

প্রশান্ত এখন অজেয়র জিম্মায়। গ্রেপ্তার করার পরদিনই তাকে তোলা হয়েছিল আদালতে, জামিন পায়নি। আরও চোদ্দো দিন তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। লোকটার সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্যও জোগাড় করে ফেলেছে অজেয়। শুধু তৃষ্ণাকে ব্ল্যাকমেলিংই নয়, বহরমপুরে আরও দুটো নাকি কেস ঝুলছে প্রশান্তর নামে। একটা জালিয়াতি, অন্যটা ব্যাঙ্ক প্রতারণার। দু-দুটো মামলার ফেরার আসামী তার হাতেই ধরা পড়ল, এই আনন্দে অজেয় টগবগ ফুটছে যেন। এবার তৃষ্ণাহত্যা মামলায় প্রশান্তকে ঝুলিয়ে দিতে পারলে তার প্রোমোশান আর ঠেকায় কে।

পার্থও দারুণ ভক্ত হয়ে পড়েছে অজেয়র। তারিফ করছে শতমুখে। এমন ঘিলুওয়ালা পুলিশ অফিসার সে নাকি জন্মে দেখেনি...মিতিনের মতো গোয়েন্দাকেও কেমন টেক্কা মেরে দিল...অজেয়কে থানা থেকে সরিয়ে এক্ষুনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে পোস্টিং দেওয়া উচিত...এমন সাতসতেরো মন্তব্য।

মিতিনের কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। তবু শুনে যাচ্ছিল চুপচাপ। হঠাৎ শুক্রবার সন্ধেয় দুম করে প্রতিবাদ করে বসল,—আমার মনে হয় অজেয়বাবুকে তুমি ওভার এস্টিমেট করে ফেলছ।

—কেন?

—প্রশান্তকে অজেয়বাবু খুনী ঠাউরেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন তো?

—না পারার কী আছে? তৃষ্ণার সঙ্গে সেদিন প্রশান্ত যে আদৌ কথা বলছিল না, এটা যখন বেরিয়ে গেছে...

—কী ভাবে বেরোল?

—পাশের ফ্ল্যাটের মহিলাই সাক্ষী দেবেন তিনি তৃষ্ণাকে দেখেননি।

—তাতে কী প্রমাণ হয়? তৃষ্ণা দরজার ওপারে ছিল না?

—ছিল, কি ছিল না, সেটা প্রশান্ত প্রমাণ করুক। দেখাক অজেয়র ডিটেক্‌শানটা ভুল।

—সরি। তোমার বোধহয় ইন্ডিয়ান জুরিসপ্রুডেন্সটা ভালভাবে জানা নেই। আমাদের দেশে অপরাধীকে অপরাধ করেনি প্রমাণ করতে হয় না। প্রমাণ করার দায়, যে অভিযোগ করছে তার। তা ছাড়া মোটিভ এত উইক, কেস টেকানো মুশকিল। ব্ল্যাকমেলার কেন তৃষ্ণাকে খুন করবে, এটা এখনও আমার ব্রেনে ঢুকছে না।

—কিন্তু খুন যে ওই হারামজাদাই করেছে, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তৃতীয় আর কেউ তো সেদিন ফ্ল্যাটে ছিল না। নিশ্চয়ই তুমি ভাবছ না, খুনটা কৌশিক করেছে?

—তারও খুন করার কোনও মোটিভ নেই।

—তাহলে?

—ওইখানেই তো সুতোর জট। আমার সূত্রগুলো জোড়া দিলে তো...।

মিতিন আচমকাই থেমে গেছে। পার্থ ভুরু কুঁচকে বলল,—কী ক্লু পেয়েছ?

জবাব না দিয়ে মিতিন পালটা প্রশ্ন করল,—সুকন্যা তো এখন ওই ফ্ল্যাটেই আছে, তাই না?

—থাকার তো কথা। তমাল তো বলল, ফেব্রুয়ারির প্রথমে ছাড়বে। সল্টলেকের দিকে নাকি উঠে যাচ্ছে। পার্থ মিটিমিটি হাসছে,—মেয়েটা চলে গেলে তমাল ফ্ল্যাটে একটা বিপদবিনাশী যজ্ঞ করবে। খাওয়া-দাওয়ার হেভি

মেনু। খাঁটি স্কচ। ফিশফ্রাই আর কাবাব সহযোগে। প্লাস, বিরিয়ানি-ফিরিয়ানি।

—বুঝলাম।...তার মানে কাল শনিবার সুকন্যা ওখানে থাকছে?

—সম্ভবত। যদি না আসানসোল যায়।

—চলো, একটা ফোন করে কাল দুপুরে ওর ফ্ল্যাটে হানা দিই একবার।

—কেন?

—গেলেই দেখতে পাবে কীভাবে একটা জট খুলি।

আজ সুকন্যার ঘরে নয়, বাইরের সোফায় বসেছে মিতিন। পাশে পার্থ। তাদের আগমনে সুকন্যা বেশ বিস্মিত হয়েছে বটে, তবে হাবভাবে তার কোনও প্রকাশ নেই। বরং সে যেন খানিকটা সমাহিত। হাল্কা একটা বিষণ্ণতা এখনও লেগে আছে তার মুখেচোখে।

মিতিন শান্তস্বরে কথা শুরু করল,—দেখেছ তো, প্রশান্ত সেন গ্রেপ্তার হয়েছে?

সুকন্যা অল্প মাথা নাড়ল,—হ্যাঁ। নিউজপেপারে পড়েছি।

—অজেয়বাবু কি তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেছেন?

—না। এখন আর কী দরকার? হয়তো পরে যখন কোর্টে কেস উঠবে, তখন সাক্ষী দিতে ডাকবেন।

—তখন সব সত্যি বলবে তো?

—নিশ্চয়ই। আমার বন্ধুকে যে মেরেছে, তার তো মোটেই ছাড়া পাওয়া উচিত নয়।

—তুমি নিশ্চিত, প্রশান্তই খুনী?

—পুলিশ তো তাই দাবি করছে। সুকন্যার মুখে যেন সামান্য ভাঙচুর, —দাবিটা ভুলই বা কেন হবে! লোকটা তো সত্যিই বজ্জাত। যেভাবে ও তৃষ্ণাকে স্কুইজ করছিল...

—সবই তো ঠিক, কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার যে মিলছে না ভাই।

—কী মিলছে না?

—যেমন ধরো, কেউ একজন স্নান করল, অথচ শাওয়ারের মুখ খটখটে শুকনো। অথবা সাড়ে বারোটায় চালানো গিজারের জল সাড়ে তিনটেতেও রীতিমতো গরম...!

—সেদিন তো বললাম, গিজারটা অফ করতে বোধহয় দেরি হয়েছিল।

—সত্যিই কি তাই?

—আমি কি মিথ্যে বলছি?

—সে তো ভাই বলেইছ। তোমাকে দেখে সেদিন বোঝাই যাচ্ছিল স্নান-টান কিছু হয়নি।

—যাহ্ বাবা! এই ছোট্ট ব্যাপারে মিথ্যে বলব কেন? বলে আমার কী লাভ?

—তাতে তোমার গল্পটা সত্যি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

—কোন গল্প? সুকন্যা এবার রীতিমতো অধৈর্য,—কী বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মিতিন সরাসরি উত্তর দিল না। মৃদু হেসে বলল,—কাজটা তোমার প্রায় নিখুঁত হয়েছিল সুকন্যা। রিগরমর্টিস ছেড়ে যাওয়া আঙুলে ভুলভাল ভাবে রিভলবার গুঁজে দেওয়া, সব জায়গা থেকে ফিংগারপ্রিন্ট মুছে ফেলা, অ্যাশট্রেটাকে এখান থেকে তুলে তৃষ্ণার ঘরে সাবধানে রেখে দেওয়া—এভরিথিং ওয়াজ পারফেক্ট।

—কী যা তা বকছেন? হোয়াই শুড আই ডু অল দিজ রাবিশ?

—জাস্ট টু প্রুভ, তোমার বান্ধবী খুন হয়েছে।

এবার পার্থর গলা থেকে বিস্ময় ঠিকরে এল,—তৃষ্ণা খুন হয়নি?

—মোটেই না। সে আত্মহত্যাই করেছিল। আর সেই আত্মহত্যাটাকে সুচারুভাবে সাজিয়ে হত্যা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল সুকন্যা।

—মানে?

—মানেটা খুব সহজ। আবার জটিলও। সুকন্যা সেদিন আসানসোল থেকে ফিরল বেলা সাড়ে বারোটায়। ফ্ল্যাটে ঢুকেই ডাকল তৃষ্ণাকে। নো সাড়া। তারপর বন্ধুর ঘরে উঁকি দিয়েই পাথর। তার রিভলবার বার করে নিয়ে সুইসাইড করেছে তার প্রিয় বান্ধবী। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে ঘরে ঢুকে একটা সুইসাইড নোটও পেল সুকন্যা। পড়েই মনে জেগে উঠল জিঘাংসা। যে বা যাদের জন্য তৃষ্ণাকে মরতে হল, তাদের কোনও একজনকে যেন তৃষ্ণার মৃত্যুর জন্য ফাঁসতে হয়—এমনই একটা বন্দোবস্ত করল সে। অ্যাশট্রেতে সিগারেট দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে, কৌশিক বা প্রশান্ত, কেউ একজন এসেছিল ফ্ল্যাটে। তা সে যেই হোক, তাকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য সুইসাইড নোটটা পুড়িয়ে ফেলল সুকন্যা। বাইরে থেকে কিনে আনা স্যান্ডুইচশুদ্ধু প্লেট সিংকে নামিয়ে রেখে ভেবেচিন্তে তৈরি করল এক চমৎকার সিচুয়েশান। তারপর লোকজনকে ডাকাডাকি। মিতিন স্বর নরম করল,—আমি কি কিছু ভুল বললাম, সুকন্যা?

সুকন্যা বদলে গেছে আমূল। দু'হাতে মুখ ঢাকল। কাঁদছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে জিন্‌স-টপ পরা মেয়েটা। আচমকা হাত সরিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল,—হ্যাঁ, আমিই করেছি। বেশ করেছি। কেন করব না বলতে পারেন? আপনি জানেন, প্রশান্ত সেন কত বড় শয়তান? তৃষ্ণা আমায় সব বলেছে, সব। কথার ম্যাজিকে ভুলিয়ে একসময়ে ওকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেছিল ওর ওই থার্ড কাজিন। নিজের বউবাচ্চা থাকা সত্ত্বেও। তৃষ্ণাকে দিঘা বেড়াতে নিয়ে গিয়ে প্রেগনেন্ট পর্যন্ত করে দিয়েছিল। শি হ্যাড টু অ্যাবর্ট দ্যাট চাইল্ড। মামার বাড়িতেও গোটা ব্যাপারটা গোপন থাকেনি। ওই প্রশান্তর কারণেই তৃষ্ণাকেও পাকাপাকি ভাবে মামা-মামির আশ্রয় হারাতে হয়। তার পরও যদি শয়তানটা এসে তৃষ্ণার ওপর মানসিক অত্যাচার শুরু করে, নিয়মিত ওর কাছ থেকে টাকা শুষে নেয়, তাকে আমি কেন ফাঁসাব না, বলুন? আমি অনেকবার তৃষ্ণাকে বলেছি, তুই কৌশিককে সব খোলাখুলি জানিয়ে দে। তোর পাস্ট জানার পরেও কৌশিক যদি তোকে ভালবাসে, তবেই তো সেটা সাচ্চা প্রেম। তৃষ্ণা শুনত না। কৌশিক জেনে ফেলবে ভাবলেই ভয়ে গুটিয়ে যেত। বলতে বলতে হাঁপাচ্ছে সুকন্যা। খানিক দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলল,—অবশ্য কৌশিককেও তো চিনি। যতই আধুনিকতার ভড়ং করুক, ওর মধ্যেও লুকিয়ে আছে সেই আদ্যিকালের পুরুষ। যারা চায় তাদের বউটি হবে নিষ্কলঙ্ক ভারজিন। তৃষ্ণা যতই ভালবাসুক, কৌশিক কখনই তৃষ্ণাকে বুঝবে না। তার অতীতটাকেও মেনে নেবে না। এমন একটা ছেলে যদি তৃষ্ণার মৃত্যুর জন্য জেলে ঢোকে, ক্ষতি কী? তা সে না ফাঁসুক, প্রশান্ত সেন তো গারদে ঢুকেছে, আমি তাতেই খুশি।

রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, জ্বালা উগরে দিয়ে প্রশমিত হল সুকন্যা। বিড়বিড় করছে আপন মনে,—আমি ভুল করিনি, আমি ভুল করিনি...

মিতিন কোমল স্বরে বলল,—না সুকন্যা, তুমি ভুলই করেছ। সুইসাইড নোট পুড়িয়ে ফেলা তোমার উচিত হয়নি। ওটা থাকলে ব্ল্যাকমেলিং আর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে প্রশান্ত সেনের শাস্তির পাল্লাটা কিন্তু অনেক ভারী হত। এখন তো সেকেন্ড অফেন্সটা থেকে লোকটা অন্তত বেঁচে যাবে। প্রমাণের অভাবে। আর খুন তো প্রমাণ হবেই না।

সুকন্যার দৃষ্টি ফের জ্বলে উঠল,—লোকটা ছাড়া পেয়ে যাবে?

মিতিন চোখ বুজে ভাবল মিনিট খানেক। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়েছে,—তৃষ্ণার জিনিসপত্র তো সব অ্যাজ-ইট-ইজ আছে, তাই না?

—আমি ওর ঘরে আর ঢুকতে পারি না।

—এখন একবার চল তো আমার সঙ্গে।

সত্যিই একভাবে পড়ে আছে তৃষ্ণার ঘরখানা। শুধু রক্তমাখা চাদরটাই যা নিয়ে গেছে পুলিশ। ত্বরিত পায়ে টেবিলের সামনে গেল মিতিন। রাইটিং প্যাডখানা হাতে নিয়ে বলল,—এই প্যাডের কাগজেই তো লিখেছিল সুইসাইড নোট?

সুকন্যা অস্ফুটে বলল,—হ্যাঁ। কেন?

—বাইরে থেকে একটা খবরের কাগজ আনো। চটপট।

পার্থই দৌড়ে এনে দিয়েছে। মিতিন তাকে বলল,—খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে জ্বালিয়ে দাও তো।

হতভম্ব মুখে নির্দেশ পালন করল পার্থ। জ্বলন্ত কাগজটা ফুঁ দিয়ে নেবাল মিতিন, চেপে চেপে দু'হাতে মেখে নিল পোড়া কাগজের কালি। রাইটিং প্যাডের প্রথম পাতায় বোলাচ্ছে কালো ছাইমাখা করতল।

কী আশ্চর্য, আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে লেখা। সাদা সাদা। আবছা। চোখের কাছে ধরে পড়ছে মিতিন।

সুকন্যা,

তোরা যখন চিঠিটা পাবি, আমি তখন অনেক অনেক দূরে। প্রশান্ত ফেউটা আমায় বাঁচতে দিল না রে। কৌশিকের সঙ্গে বিয়ের দিনক্ষণ পাকা হয়ে গেছে শুনে প্রশান্ত এখন তিন লাখ টাকা চাইছে। কৌশিককেও চিনে গেছি, সেও আমায় কিছুতেই ফিল করবে না। আমার মরে যাওয়াই ভাল রে। রাগ করিস না, তোর ঘর থেকে রিভলবারটা নিয়ে এলাম। আশা করি এর একটা গুলি আমাকে আমার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। সব থেকে কম সময়ে। ভয় করছে, কিন্তু এটাই তো ভয়ের ইতি। শেষবারের মতো তোকে অনেক অনেক ভালবাসা জানালাম।

তোর তৃষ্ণা।

পাঠ সমাপ্ত করে মিতিন জিজ্ঞেস করল,—কী, এইটাই তো লেখা ছিল?

সুকন্যা ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে,—হ্যাঁ। কিন্তু এতে কি কাজ হবে?

মিতিন বলল,—দেখা যাক। অজেয়বাবুকে তো জানাই। প্যাডটা এখন এভাবেই থাক এখানে। হাত দিও না।

ঠান্ডা অনেকটাই কমে গেছে। মাঘের দুপুর পায়ে পায়ে চলেছে বিকেলের দিকে। রোদ্দুরে যেন কোন অচেনা বিষাদের আভাস। হাওয়া থেমে আছে, থমকে আছে।

রাস্তায় নেমে পার্থ মুগ্ধ স্বরে বলল,—তুমি সুইসাইডের লাইনে ভাবলে কী করে?

—সুকন্যার সেদিনের একটা কৌতূহল দেখে।

—কী?

—রিগার্ডিং অজেয় সিন্‌হা। উনি কী রকম বুদ্ধিমান জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল। মনে হল, কী যেন বলতে চাইছিল যেন। তখনই খুট করে খটকা লাগল একটা। তারপর ভালভাবে লক্ষ করে দেখলাম গ্যাসওভেনের পাশে কাগজপোড়ার ছাই। সিংকে নামানো সুকন্যার প্লেটের নীচেও ওই ছাই লেগে ছিল।

—ওটাই সুইসাইড নোট পোড়ানোর ছাই?

—হ্যাঁ স্যার।

—স্ট্রেঞ্জ! তখনই বলোনি কেন?

—প্রথমত, অজেয়র বুদ্ধির দৌড়টা দেখছিলাম। আর সেকেন্ডলি...। মিতিন ফিক করে হাসল,—সত্যি বলব?

—শুনতেই তো চাইছি।

—তৃষ্ণা যে একটা ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার, সেদিনই টের পেয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল প্রশান্ত ব্যাটার যদি তিনশো দুই ধারায় শাস্তি হয় তো মন্দ কী! পরে ভেবে দেখলাম, ও বাছাধন পিছলে যাবে। যাবেই। অতএব নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার চার্জটা অন্তত সামলাক।

পার্থর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। মিতিনের পিঠে আলগা চাপড় দিয়ে বলল,—দ্যাট্‌স গ্রেট ডার্লিং। অজেয় নয়, তুমিই জিনিয়াস।

মিতিন কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকাল,—এ আর নতুন কথা কী, এ তো আমি জানিই।

মারণ বাতাস

ইদানীং কাজেকর্মে অফিসপাড়ায় এলে একবার করে লালবাজারে ঢুঁ মেরে যায় মিতিন। ডিসি ডিডি অনিশ্চয় মজুমদারের ঘরে বসে কিছুক্ষণ চা-টা খায়, গল্পসল্প করে। পেশার সূত্রে অনিশ্চয়ের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য অনেক বেড়েছে, সাংঘাতিক ব্যস্ততা না থাকলে অনিশ্চয়ও তাকে দেখলে খুশি হন খুব, মহা আনন্দে আড্ডা জমান। সময়টা মিতিনের মন্দ কাটে না। শিক্ষালাভও হয়। অনিশ্চয়ের দীর্ঘ পুলিশজীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনাও তো এক ধরনের শিক্ষাই।

বিকেলে চেম্বারে পা রাখতেই ডিসিসাহেব হইহই করে উঠলেন, আরে ম্যাডাম, আসুন আসুন। ভাল দিনেই এসেছেন। আজ খাঁচায় এক আজব চিড়িয়া ধরা পড়েছে।

—চিড়িয়া? মিতিন ভুরু কোঁচকাল।

—ইয়েস। চিড়িয়া। বুলবুলও বলতে পারেন।

কাঁধের দোপাট্টা ঠিক করতে করতে মিতিন চেয়ারে বসল, কী কেস বলুন তো?

—গত বুধবার খবরের কাগজে পড়েছিলেন? আলিপুরের মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং আকাশলীনায় এক পঙ্গু তরুণের রহস্যজনক মৃত্যু?

—সৌম্যরূপ চৌধুরী? বয়স তেত্রিশ, ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, অ্যাপারেন্টলি মনে হয়েছিল হার্টঅ্যাটাক, কিন্তু ডাক্তার ফাউল প্লে আছে বলে সন্দেহ করছে...

—বাহ্, বাহ্, খুব খুঁটিয়ে পড়েছেন তো! টেবিলের পেপার ওয়েটটাকে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেন অনিশ্চয়, বডি আমরা পোস্টমর্টেমে পাঠিয়েছিলাম। ইটস্ আ কেস অফ প্ল্যানড্ হোমিসাইড।

—তাই?

—হুম্। সর্বত্র তো আমাদের কলকাতা পুলিশের বদনাম। আমাদের নাকি আঠারো মাসে বছর! আর এই কেসের মার্ডারার আজই কট্। উইদিন ছিয়ানব্বই ঘণ্টা।

—আচ্ছা? আপনারা দেখছি তাহলে সত্যিই জেগে উঠেছেন। মিতিন একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। হাসতে হাসতেই বলল, তা সেই দুরাত্মাটি কে?

—খুব তো গোয়েন্দাগিরির এজেন্সি খুলে পয়সা কামাচ্ছেন, গেস্ করুন তো কে?

—আমি কী করে বলব। কেসটার আমি কীই বা জানি। মিতিন চুল দোলালো, হবে কোনও শত্রুফত্রু।

—শত্রু তো বটেই। যাকে বলে জাতশত্রু। অনিশ্চয় দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন, হেঁ হেঁ, বুঝলেন না তো। ম্যারেড মানুষের জাতশত্রু তো একজনই। স্ত্রী। ওয়াইফ।

—বউ খুনি? মিতিন পলকে টানটান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বধূহত্যার খবর পড়ে আপনারা তো খুব তিড়িংবিড়িং লাফান। কথায় কথায় বরের নামে ফোর নাইন্টি এইট ঠুকছেন। স্বামীহত্যার কেস শুনেই অমনি কানে লেগে গেল, অ্যাঁ?

—তা নয়। তবু, কাগজে পড়লাম...লোকটা পঙ্গু ছিল...

—আপনারা সব পারেন ম্যাডাম। মেয়েদের ডিকশনারিতে দয়ামায়া বলে কোনও শব্দ নেই। অনিশ্চয় নড়েচড়ে বসলেন, ভাবতে পারবেন না কীভাবে খুন করেছে। একেবারে কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। ইন আ মোস্ট স্যাভেজ ম্যানার।

—কী রকম?

—এয়ার এম্বলিজম। ফাঁকা সিরিঞ্জের বাতাস ভিক্টিমের বডিতে পুশ করে...সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। অক্কা।

—ও নোহ্। কিন্তু এই মেথডের খুন তো সহজে ধরা যায় না?

—সেই জন্যই তো চান্সটা নিয়েছিল। তবে ঝানু ডাক্তারের চোখ এড়াবে কী করে! সিরিঞ্জে বেশ কয়েক ড্রপ ব্লাড এসে গিয়েছিল। দেখেই ডাক্তার বলে দিলেন, এটা নরমাল ইনজেকশান পুশ করার কেস নয়।

—দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?

—ইন্টারেস্টিং তো বটেই, তবে সিম্পল। গল্প একেবারে দুয়ে দুয়ে চার।

—কী রকম? কী রকম?

—কৌতূহল হচ্ছে তো? হা হা হা, কিউরিওসিটি দাই নেম ইজ উয়োম্যান।

—আহা, বলুনই না।

—বলছি, বলছি। আমি নিজে ইনভেস্টিগেশানে গিয়েছিলাম। আপনাকে পুরো ডিটেল দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন, কোনও ফাঁকফোকর খুঁজে পান কি না। তার আগে বলুন, চা খাবেন না কফি?

—কফিই চলুক।

বেল বাজিয়ে কফি বিস্কিটের অর্ডার দিয়ে সৌম্যরূপ-উপাখ্যান শুরু করলেন অনিশ্চয়। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি বেশ বৈঠকি ধরনের। তারিয়ে তারিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলেন কিছুটা, থেমে যান হঠাৎ-হঠাৎ, লক্ষ করেন শ্রোতার প্রতিক্রিয়া। টুকরো-টাকরা নিজস্ব টিপ্পনীও জোড়েন মাঝেমাঝে। তাতে গল্প আরও জমে যায়। গল্পের মধ্যে আজ ছেদও পড়ল অল্পস্বল্প। ফাইল হাতে অফিসাররা ঢুকছে, সইসাবুদ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিংবা বেজে উঠছে টেলিফোন।

মোটামুটি কাহিনিটা এরকম।

সৌম্যরূপ চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রলেখা রায়ের বিয়ে হয়েছিল বছর চারেক আগে। প্রেমের বিয়ে নয়, সম্বন্ধের বিয়ে। চিত্রলেখার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালই। বাবা রেলের অফিসার, মা স্কুলে পড়ান, চিত্রলেখা তাঁদের একমাত্র সন্তান, বেহালায় তাঁদের নিজস্ব দোতলা বাড়ি। সৌম্যরূপরাও পয়সাঅলা ঘর। বাবা ডাক্তার ছিলেন, নিউরোলজিস্ট, ভালই পশার ছিল। মা-ও যথেষ্ট শিক্ষিত, এম এ পাস, তবে নির্ভেজাল হাউসওয়াইফ। সৌম্যরূপের একটি ভাইও আছে। অভিরূপ। অনিশ্চয়ের মতে সেটি একটি অকালকুষ্মাণ্ড। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হয়েছে, চাকরিবাকরির কোনও চেষ্টা নেই, বাপের রেখে যাওয়া পয়সায় খায়দায়, মস্তি মানায়, পপ্ মিউজিক না র‍্যাপ মিউজিক কীসের একটা দলে ঝ্যাং ঝ্যাং এদিক-ওদিক গিটার বাজিয়ে বেড়ায়। পড়াশুনোর দৌড় গ্র্যাজুয়েশান অবধি, তাও কেঁদে-ককিয়ে।

লেখাপড়ায় রীতিমতো ব্রিলিয়ান্ট ছিল সৌম্যরূপ। হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম একশোজনের মধ্যে ছিল। চাকরিও সে খুব একটা খারাপ করত না। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সেই পিটারসন ইন্ডিয়ার ডেপুটি মার্কেটিং ম্যানেজার। চিত্রলেখাও হাইলি কোয়ালিফায়েড। ফিজিওলজির এম এস-সি। অর্থাৎ সৌম্যরূপ আর চিত্রলেখা ছিল পারফেক্ট গুড ম্যাচ।

বিয়ের পর দু'জনে প্রথমে দিব্যি ছিল, প্রবলেম শুরু হল বিয়ের মাস ছয়েক পর থেকে। দু'জনে দার্জিলিং গ্যাংটক বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে নাকি কোনও পাথুরে রাস্তায় আছাড় খেয়েছিল সৌম্যরূপ, তখন থেকেই তার অসুখের সূত্রপাত। প্রথমে স্যাক্রোইলিয়াটিস। কোমরে অসহ্য ব্যথা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে পারে না...। গ্যাংটকেই ডাক্তার দেখিয়েছিল, কলকাতায় ফেরার পর ছেলের বাবাই ছেলের চিকিৎসা করতে থাকেন। এমন সময়ে চিত্রলেখা একটি চাকরি পেয়ে গেল কলেজে। শ্বশুর-শাশুড়ির বিশেষ মত ছিল না। সৌম্যরূপের তো ছিলই না। তবু সবার আপত্তি উপেক্ষা করে চাকরিতে যোগ দিল মেয়েটা। সম্ভবত তখন থেকেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে।

নিজের চাকরি যখন যায় যায়, তখনই বউ একটা ভাল কাজ পেয়ে গেল, ক'টা স্বামীই বা এ অবস্থা খুশি মনে মেনে নিতে পারে!

ইতিমধ্যে সৌম্যরূপের অসুস্থতা আরও খারাপের দিকে গড়াচ্ছিল। বাবা নিজে তো চিকিৎসা চালাচ্ছিলেনই, এককাঁড়ি স্পেশালিস্টও এনে দেখিয়েছেন। কিন্তু লাভ হচ্ছিল না কোনও। বছর দেড়েকের মাথায় পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল সৌম্যরূপ। শিরদাঁড়া একদম স্টিফ, যাকে বলে ব্যাম্বুস্পাইন। সর্বক্ষণ হাত-পা ঝিনঝিন, ঘাড়ে কোমরে ব্যথা... অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস বেচারিকে সম্পূর্ণ ইনভ্যালিড করে দিল।

এরকম একটা সময়ে সৌম্যরূপের বাবা মারা যান। হঠাৎই। সেরিব্রাল অ্যাটাক। ছেলের চিন্তায় ভয়ঙ্কর উদ্বিগ্ন থাকতেন, বোধহয় তারই পরিণাম। ভদ্রলোকের মৃত্যুর বছরখানেকেব মধ্যেই চিত্রলেখা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেহালায় বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর থেকে একদমই আর যেত না সৌম্যরূপের কাছে।

কিন্তু হঠাৎ গত সোমবার সন্ধেবেলা চিত্রলেখা সৌম্যরূপের বাড়ি এসে হাজির। স্বামীকে ডিভোর্স পেপার সই করানো জন্য। আধঘণ্টা একঘণ্টা মতন ছিল। সে চলে যাওয়ার পরই ছেলেটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সৌম্যরূপের মা ছেলেব হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ভেবেই তড়িঘড়ি ডাক্তারকে কল দেন, কিন্তু ডাক্তার এসেই গোটা ব্যাপারটা ঘুলিয়ে দেয়। বছর দুয়েক ধরেই সৌম্যরূপের হাতে স্ক্যাল্প ভেন সেট লাগানো থাকত। ইনজেকশান দিয়ে দিয়ে আর শিরা খুঁজে পাওয়া যেত না বলে ওই স্ক্যাল্প ভেন সেটের

মধ্যে দিয়ে ইনজেকশান পুশ করা হত পেশেন্টকে। বাড়ির যে কেউই দিয়ে দিতে পারত। ঘুমের ইনজেকশান, ব্যথার ইনজেকশান...। ওই স্ক্যাল্প ভেন সেটেই একটা পঞ্চাশ সিসির সিরিঞ্জ লাগানো ছিল সেদিন, রক্তের ফোঁটাসুদ্ধ। ওই সিরিঞ্জের গায়ে চিত্রলেখার আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে। এমন একটি মোক্ষম প্রমাণ হাতে এসে যাওয়ার পর মেয়েটিকে ধরতে পুলিশের আর সময় লাগেনি।

মিতিন প্রায় নিঃশব্দে শুনল পুরোটা। কফি এসে গেছে, চুমুক দিচ্ছে কাপে। ভাবছে কী যেন।

অনিশ্চয় মজুমদার ভুরু নাচালেন, কী? গল্পে ফাঁক পেলেন কিছু? মেয়েটার ফেভারে?

—ফাঁক কী বলছেন? আমি তো ইয়া বড় বড় গর্ত দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটা কখন এসেছিল, ক'টায় গেল, কখন ডেডবডি আবিষ্কার হল, এসব তো কিছুই বললেন না।

—ওগুলো সব ফুলপ্রুফ। আমরা বাজিয়ে দেখেছি। মেয়েটা এসেছিল সওয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে, গেছে ঠিক ন'টায়। ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ান চিত্রলেখার আসা-যাওয়া দুইয়েরই সাক্ষী। ডেডবডি আবিষ্কার হয়েছে অ্যারাউন্ড সাড়ে দশটা।

—কে আবিষ্কার করেন?

—সৌম্যরূপের মা।

—মারা যাওয়ার দেড় ঘণ্টা পর কেন?

—চিত্রলেখাকে দেখেই সৌম্যরূপের মা পাশের ফ্ল্যাটে চলে গিয়েছিলেন। বোঝেনই তো, ছেলের এই দশায় বউ তাকে ডিভোর্স করতে চাইছে...কোন শাশুড়ি এমন পুত্রবধূর মুখদর্শন করতে চায়। সাড়ে ন'টা নাগাদ অবশ্য তিনি ফিরে আসেন। এসে পরদা সরিয়ে ছেলেকে একবার দেখেও গেছেন। ছেলে ঘুমোচ্ছে ভেবে তাকে আর ডাকেননি। মোটামুটি সাড়ে দশটা নাগাদ রাতের খাবার খেত সৌম্যরূপ, তখনও ছেলে সাড়া দিচ্ছে না দেখে...। ডাক্তার এসেছিল রাত এগারোটা নাগাদ। তখন সবে রিগর মর্টিস সেট ইন করতে শুরু করেছে। ডাক্তারবাবুই মৃত্যুর টাইম লিখে দিয়েছেন—রাত্তির ন'টা। অনিশ্চয় কফি শেষ করে পেয়ালা পিরিচ টেবিলে রাখলেন, ড্রয়ার থেকে সিগারেটের পাউচ বার করেছেন। হাতের চেটোয় তামাক পিষতে পিষতে বললেন, ইঞ্জেকশানটা ফুঁড়ে দিয়েই দুদ্দাড়িয়ে

পালিয়েছিলেন লীলাময়ী। সিরিঞ্জটা যে খুলে সরিয়ে ফেলতে হয়, এ হুঁশও তখন আর ছিল না। বোঝেনই তো খুনি একটা না একটা ভুল করেই।

—তবু...

—কী তবু?

—খুনের মোটিভটা কী? যার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়িই হয়ে যাচ্ছে, তাকে খামোকা খুন করতে যাবে কেন?

—ওইটেই তো খেলা। ওই জন্যই তো বললাম, আজব চিড়িয়া। পাকানো সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইটার জ্বালালেন অনিশ্চয়। আগুনের শিখা ধরে রেখে চোখ টিপে বললেন, ডিভোর্সের কাগজটা ক্যামোফ্লেজ। ছুতো। ওই ফ্ল্যাটে এন্ট্রি নেওয়ার একটা পাসপোর্ট। ও জানত বরকে নিরালায় পাবেই।...ডিভোর্স- টিভোর্সের ওর কিছু দরকার নেই, বর টেঁসে গেলে বরের ন্যাচারাল ওয়ারিশন হিসেবে তার ভাগের সম্পত্তির প্রতিটি পাইপয়সা হাতে চলে আসবে। আর তাই নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে নতুন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠবে। কী নিখুঁত প্ল্যান।

—চিত্রলেখা আবার বিয়ে করছিল নাকি?

—তবে আর বলছি কী? লটঘট চালাচ্ছিল তো গুণময়ী। নিজের কলেজের এক প্রফেসারের সঙ্গে। বেচারা সৌম্যরূপ হয়ে গিয়েছিল ডগ্ ইন দা ম্যান্জার। এমন একটা মতলব ভাঁজল যাতে ডগ ভি খতম, মালকড়িও হাতে এসে গেল, লোকে নিন্দেও করতে পারবে না, সবাই বলবে আহা কচি বিধবা নতুন করে যদি জীবন শুরু করেই...। সবই ঠিকঠাক ছিল, আলমারি থেকে গয়নাগাঁটিগুলো পর্যন্ত বের করে নিয়েছিল, শুধু ওই সিরিঞ্জটা যদি খুলে নিয়ে যেত...

—আচ্ছা, এক সেকেন্ড। সৌম্যরূপকে ব্যথার ইনজেকশান, ঘুমের ওষুধ, সবই কি ওই পঞ্চাশ সিসি সিরিঞ্জ দিয়ে দেওয়া হত? ওগুলো তো ছোট ইনজেকশান, পাঁচ সিসির সিরিঞ্জ হলেই হয়ে যায়।

—ওই গোবদা সিরিঞ্জ তো অন্য কাজের জন্য রাখা থাকত। সৌম্যরূপের যখন খুব বাড়াবাড়ি চলত, তখন নাকি নাকে একটা টিউব ফিট করে ওকে খাওয়ানো হত।

—রাইলস টিউব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই সব স্যুপ-ট্যুপ পঞ্চাশ সিসি সিরিঞ্জটায় ভরে ভায়া রাইলস টিউব ফিড দেওয়া হত পেশেন্টকে। মেয়েটা কী ধড়িবাজ দেখুন।

জানত, বড় সিরিঞ্জ ছাড়া এয়ার এমবলিজম করা যায় না।...ফিজিওলজির স্টুডেন্ট তো...।

—হুম। মিতিন একটুক্ষণ চুপ থেকে ফের জিজ্ঞেস করল, একটা কথা। মেয়েটা কদ্দিন আগে সৌম্যরূপকে ছেড়ে চলে গেছিল?

—এই তো লাস্ট পুজোর আগে...ধরুন প্রায় আট-ন-মাস।

—কেন গেছিল?

—আশিক জুটে গেছিল, তাই। শ্বশুরবাড়িতে থেকে প্রেম করার অসুবিধা হচ্ছিল। অবশ্য মেয়ের বাপ-মা অন্য কথা বলছে। তাদের বক্তব্য, সৌম্যরূপ অসম্ভব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল, যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করত বউকে, নোংরা নোংরা কথা বলত...এমন চেঁচামেচি করত যে নার্স পর্যন্ত টিকত না। অনিশ্চয় হুশ হুশ দুটো টান দিয়ে সিগারেট গুঁজলেন অ্যাশট্রেতে, তবে বাপ-মা মেয়েকে ভাল প্রমাণ করার জন্য এসব তো বলবেই।

—কিন্তু কথাগুলো তো মিথ্যে নাও হতে পারে।

—ডাজনট ম্যাটার। চিত্রলেখা যে ইদানীং প্রেম করছিল, এটা ওর বাবা-মাও অস্বীকার করতে পারেনি। আমাদের পক্ষে ওটাই যথেষ্ট।

—উমম্।...আর সৌম্যরূপের ভাইটা সেদিন কোথায় ছিল? সন্ধেবেলা?

—ওই যে বললাম, ব্যান্ডপার্টি, পপ-মিউজিক। বাবু সেদিন দলবল নিয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অ্যানুয়াল ফাংশানে প্রোগ্রাম করছিলেন। আমি ক্রস চেক করে নিয়েছি। ছেলেটা তখন ওখানেই ছিল।

—ফিরেছে কখন?

—রাত বারোটার পর। আমাদের আলিপুর থানা তখন অকুস্থলে পৌঁছে গেছে। পুলিশ দেখে ছোকরা নাকি ঠকঠক কাঁপছিল। জোর শক পেয়েছে, আর কী। যতই হোক, দাদার মৃত্যু বলে কথা...

—সৌম্যরূপের মার এখন কী অবস্থা?

—পাথর। এক্কেবারে পাথর। মাত্র দু'বছরের মধ্যে এমন বড় বড় দুটো আঘাত...। স্বামী গেল, ছেলে গেল...। অনিশ্চয়ের মুখে হালকা ছায়া, আমার তো মেয়েটার বাবা-মার কথা ভেবেও খারাপ লাগছে। আজ নাকি খুব ছোটাছুটি করেছে কোর্টে, তাও তো মেয়ে বেল পেল না। এখন সাত দিনের পুলিশ কাস্টডি।... কী কপাল। ওই বজ্জাত মেয়ের জন্য বাপ-মার মানসম্মান ধুলোয় মিশে গেল।

—মেয়েটা এজাহার দিয়েছে? স্বীকার করেছে সব?

—ওফ, সে মেয়ে যে কী ঠ্যাঁটা। মুখে একদম কুলুপ এঁটে বসে আছে। শুধু একটিই বুলি তোতাপাখির মতো আউড়ে যাচ্ছে। আমি সৌম্যকে মারিনি। আমি বেরিয়ে আসার সময়ে সৌম্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আমি ওকে মেপে দু-সিসি কামপোজ ইনজেকশান দিয়েছিলাম। সৌম্যরই রিকোয়েস্টে। তার বেশি আমি আর কিছু জানি না।

মিতিন কী যেন চিন্তা করল একটু। ঘড়িও দেখল একবার। পার্থ আজ চটপট ফিরে আসবে বাড়িতে, সন্ধেবেলা বুমবুমকে নিয়ে দিদির বাড়ি যাওয়ার কথা। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। কেসটা যেন টানছে, চুম্বকের মতো।

মিতিন বলেই ফেলল, পুলিশি কাস্টডি মানে মেয়েটা তো এখন এখানেই? এই লালবাজারেই?

অনিশ্চয় হাত ওল্টালো, আর কোথায় যাবে? তিনি এখন লকআপ আলো করে আছেন।

—একটু আনা যায় মেয়েটিকে?

—কেন?

—দেখতাম। কথা বলতাম একটু।

—আপনার থার্ড আই দিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চান, অ্যাঁ? অনিশ্চয় হো হো হেসে উঠলেন, আরে ম্যাডাম, গল্পে উপন্যাসে আপনাদের, আই মিন পেশাদার গোয়েন্দাদের, যতই গুণগান করা হোক না কেন, আসল কাজ কিন্তু করি আমরাই। জহুরি যেমন রত্ন চেনে, আমরাও তেমন ক্রিমিনালদের চিনি। আমাদের খুব একটা ভুল হয় না। আপনি শত চেষ্টাতেও ওকে বাঁচাতে পারবেন না।

—কে বলল আমি বাঁচাতে চাই? আমি জাস্ট যাচাই করতে চাই। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, কোথাও একটা ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। মোটিভ ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না।

—ও কে। দেখুন যাচাই করে। কয়লা যদি হিরে বনে যায়...।

একজন অফিসারকে তলব করে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন অনিশ্চয়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বন্দিনী হাজির। সঙ্গে ইউনিফর্ম শোভিতা দুই মহিলা প্রহরী।

কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে চিত্রলেখাকে দেখল মিতিন। বয়স বড়জোর সাতাশ-আঠাশ। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বা, দোহারা

চেহারা, রং মোটামুটি ফর্সার দিকে, মুখখানা ভারি মিষ্টি, লাবণ্যমাখা। তবে ওই মুখে এখন ঘন মেঘ জমে আছে, বাইরের আকাশের মতো। চুল-টুল উশকো-খুশকো চিত্রলেখার, ভাসা ভাসা চোখের নীচে গাঢ় কালির পোঁচ। মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই। দু গালে সাদা খড়ির দাগ। কাঁদছিল কি?

অনিশ্চয় গমগমে গলায় বললেন, আপনাকে কেন ডাকা হয়েছে বুঝতে পারছেন?

চিত্রলেখা উত্তর দিল না। মুখ ফিরিয়েছে অন্য দিকে।

—ইনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। যা প্রশ্ন করবেন, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

চিত্রলেখা ভাবলেশহীন।

মিতিন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম আপনি কলেজে চাকরি করেন। কোন কলেজে?

চিত্রলেখা ঘুরে তাকালই না। স্থির চোখে দেওয়াল দেখছে।

অনিশ্চয় গর্জে উঠলেন, কী হল? জবাব কই?

শব্দের অভিঘাতে যেন কেঁপে উঠল চিত্রলেখা। ঘাড় ঘোরাল একবার। চোয়াল শক্ত করে রেখেছে, তবে ওঠাপড়া করছে কণ্ঠনালী। আবার ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মিতিন অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়াল। আলতো হাত রেখেছে গিয়ে মেয়েটার পিঠে। টেনে পাশের চেয়ারে বসাল।

কোমল গলায় বলল, নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

কথাটা যেন কানেই গেল না চিত্রলেখার। কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে।

মিতিন গলা আরও নরম করল, কথা বলবেন না?

ঠোঁট নড়ল চিত্রলেখার, আমার বলার কিছু নেই। আমি তো দোষী সাব্যস্ত হয়েই গেছি।

—মোটেই না। যতক্ষণ পর্যন্ত না জজ রায় দিচ্ছেন, ততক্ষণ অবধি আপনি দোষী নন...। আমাকে একটা উত্তর দেবেন? আপনাকে দেখে সৌম্যরূপের সেদিন কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল?

—বলে কী লাভ? কে বিশ্বাস করবে? চিত্রলেখা নাক টানল, সৌম্য সেদিন আশ্চর্য রকম শান্ত ছিল। এককথায় সই করে দিয়েছিল। নিজেই বলল গয়নার বাক্সটা নিয়ে যেতে।

—বেশ।...এবার বলুন তো অত বড় সিরিঞ্জে ইনজেকশান দিতে গেলেন কেন?

চিত্রলেখার ভুরু কুঁচকে গেল, ছোট সিরিঞ্জ খুঁজে পাইনি তাই। ওটাই হাতের কাছে ছিল...সৌম্যই বলল...

—আপনি জানেন, সিরিঞ্জে বাবলস্ থাকলে মানুষ মারা যেতে পারে?

—জানি। কিন্তু আমি সৌম্যকে মারিনি।

—ফের এক কথা? ঘর কাঁপিয়ে ধমকে উঠলেন অনিশ্চয়, তুমি মারোনি তো কে মেরেছে? ভূত?

তীব্র দৃষ্টি হেনে বারেক অনিশ্চয়কে দেখল চিত্রলেখা। তারপর মাথা হেঁট করে বসে আছে। মিতিন একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে ডিভোর্সের কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার স্বামী জানতেন?

চিত্রলেখা নীরব।

—আপনি যখন ফ্ল্যাট থেকে চলে এলেন, তখন কি আপনার শাশুড়ি ফিরে এসেছিলেন?

জবাব নেই।

—আপনার সঙ্গে শাশুড়ি দেওরের রিলেশান কেমন ছিল?

এবারও উত্তর নেই। চিত্রলেখা যেন এখন গ্রানাইটের দেওয়াল, প্রতিটি প্রশ্নই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে মিতিনের কাছে। আরও দু-একটা জিজ্ঞাসা ছুড়ে হাল ছেড়ে দিল মিতিন। হেলান দিয়ে বসেছে চেয়ারে।

অনিশ্চয়ের নির্দেশে চিত্রলেখাকে নিয়ে চলে গেল দুই মহিলা প্রহরী। ঘর ফাঁকা হতেই অনিশ্চয় বললেন, দেখছেন তো কেমন ঠ্যাটা? কোথায় বর মরেছে, একটু চোখের জল থাকবে, অনুশোচনা হবে, তা নয়...দেখে নেবেন আমি ওকে ফাঁসিতে লটকাব।

মিতিন গুম হয়ে বসেছিল, হঠাৎ বলে উঠল, আমি আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব মিস্টার মজুমদার?

—বলুন।

—আমি কি ওর বাড়ির লোকজনকে একটু মিট করতে পারি? মানে আনঅফিশিয়ালি?

—এখনও সংশয়?

—উঁহু। কৌতূহল। মিতিন বায়নার সুরে বলল, প্লিজ দাদা, আমি কেসটা একটু স্টাডি করতে চাই। পরে হয়তো আমার কাজে লাগবে।

—ও কে। আমাদের ইনভেস্টিগেশানটাকে ডিস্টার্ব না করে যা খুশি করতে পারেন।

মিতিন আর বসল না। দুটো-একটা কথা বলে উঠে পড়ল। চিন্তিত মুখে। পথে বেরিয়ে ব্যাগ থেকে চিরকুটটা বার করে দেখল একবার। আলিপুর অ্যাভেনিউয়ের ঠিকানা, বেশ পশ এলাকা। আজই কি যাবে একবার?

থাক, পার্থ চিন্তায় পড়ে যাবে। বরং কাল সকালই ভাল।

দুই

আকাশলীনা বাড়িখানা বিশাল। আটতলা। প্রতিটি তলায় ছ'খানা করে ফ্ল্যাট, দুটি লিফট দু'দিকে অনবরত ওঠানামা করছে। গেটে শ্যেনচক্ষু মেলে বসে আছে সিকিউরিটি। তারাই এ বাড়ির দারোয়ান। গেট পেরোতে গেলে যে কোনও অপরিচিত লোককেই তাদের খাতায় নাম লিখিয়ে ঢুকতে হয়। কোথায় যাচ্ছে সেটাও। নিয়ম।

মিতিন অবশ্য লিফ্ট নিল না। হেঁটে হেঁটে উঠল চারতলায়। প্রতি তলাতেই প্রকাণ্ড প্যাসেজ। উঠতে উঠতে দেখছিল মিতিন। কী সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি। একটা ধুলোর কণা পর্যন্ত নেই। আহা কবে যে মিতিনদের নিজস্ব বাড়ি হবে!

নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের বেল টিপতেই দরজা খুলেছে এক তরুণ। টকটকে ফর্সা রং, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, নিখুঁত কামানো গাল। একমাথা চুল ফুলে ফুলে আছে। চোখটাও ফোলা ফোলা, দেখে মনে হয় এইমাত্র ঘুম থেকে উঠল।

যুবকটি কায়দা করে জিজ্ঞেস করল, ইয়েস?

মিতিন সপ্রতিভ গলায় বলল, আপনিই নিশ্চয়ই অভিরূপ চৌধুরী?

যুবকের চোখ সরু হল, আপনি...?

—আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আমি লালবাজার থেকে আসছি। আপনার দাদা সৌম্যরূপ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ আছে।

অভিরূপের মুখচোখ পলকে বদলে গেছে। পাংশু মুখে বলল, আর জিজ্ঞাসাবাদের কী আছে? মার্ডারার তো অলরেডি অ্যারেস্টেড।

—তা হয়েছে। কিন্তু কেস সাজাতে গেলে আরও তো কিছু ইনফরমেশান দরকার। আশা করি আপনারা সহযোগিতা করবেন।

—ও, শিওর। অভিরূপ দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, আসুন।

ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে মিতিন চমকিত। অতিকায় ড্রয়িং-হল, শ্বেতপাথরের মেঝে, মহার্ঘ সব ফার্নিচার, কোণে দেওয়ালজোড়া অ্যাকোয়ারিয়াম। বৈভব যেন চারিদিক থেকে ঠিকরে পড়ছে। এ-বাড়ির সম্পত্তির লোভে এক-আধটা খুন ঘটে যেতেই পারে।

লম্বা টানা নরম সোফায় এসে বসল মিতিন। অভিরূপ ভেতরে গিয়েছিল, এক মধ্যবয়সী মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মহিলা তেমন সুশ্রী নন, বরং বেশ কুরূপাই, তবে গায়ের রংটি ক্যাটকেটে সাদা। মুখ চোখ কেমন নিষ্প্রাণ মহিলার, দৃষ্টি শূন্য, দেখেই বোঝা যায় এখনও শোক সামলে ওঠেননি।

মিতিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জানি আপনাদের বিরক্ত করা হচ্ছে। তবু কয়েকটা প্রশ্ন না করলে তো...

—না, বলুন। মহিলা উলটো দিকের সোফায় বসলেন, আমি ঠিক আছি।

—আমি আপনাদের একটু আলাদা আলাদা করে প্রশ্ন করতে চাই। বলেই মিতিন অভিরূপের দিকে তাকিয়েছে, যদি কিছু মনে না করেন...

—নো প্রবলেম। আমি ভেতরে যাচ্ছি। অভিরূপ যেতে গিয়েও থমকাল, আপনার জন্য চা বা শরবত পাঠিয়ে দেব?

—নো থ্যাংকস্। একটু জল খাওয়াতে পারেন। ঠান্ডা।

অভিরূপ অন্দরে মিলিয়ে যেতেই কথা শুরু করল মিতিন, দেখুন মিসেস চৌধুরী, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন কাল সকালে আপনার পুত্রবধূকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?

—জানি। লালবাজার থেকে ফোন এসেছিল।

—আপনি কি ভাবতে পেরেছিলেন আপনার পুত্রবধূ এমন একটা কাজ করতে পারে?

—না। মহিলার স্বর ভেজা ভেজা, আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।

—আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল?

—খুব ভাল ছিল বলব না। আমার ছেলেকে যে অত কষ্ট দিয়েছে, তাকে কী করে আমি...?

—বিয়ের পর থেকেই কি সে আপনার ছেলেকে কষ্ট দিয়েছে?

—তা কেন! ওদের তো মোটামুটি মিলমিশই হয়েছিল। আমিও তখন লেখাকে মাথায় করে রেখেছিলাম। কিন্তু যেদিন থেকে আমার ছেলেটা অসুস্থ হয়েছে, লেখা বড্ড অবহেলা করেছে তাকে।

—চিত্রলেখার চাকরি করাটাও তো আপনার পছন্দ ছিল না?

—আমার স্বামীরও পছন্দ ছিল না।

—স্বাভাবিক। আপনাদের সংসারে তো অর্থের তেমন প্রয়োজন নেই।

—বলুন? আপনিই বলুন? মহিলা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন, সমু বড় ভালবাসার কাঙাল ছিল। একটু বউয়ের সঙ্গ চাইত। বউকে সব সময়ে কাছে কাছে চাইত। অথচ মেয়েটা কী নিষ্ঠুরভাবে ওকে ছেড়ে চলে গেল।

কাজের লোক ট্রেতে জল নিয়ে এসেছে। বছর পঁয়ত্রিশের এক কালোকুলো বউ। মিতিনের জল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বউটা, তারপর ট্রে নিয়ে চলে গেল, ঘুরে তাকাতে তাকাতে।

মিতিন আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, এ কি আপনাদের রাতদিনের লোক?

—না। সকালে আসে, সন্ধেয় যায়।

—একাই সব করে?

—আর একজন আছে। গোপালনগরের দিক থেকে আসে। কাচাকুচি করে, ঘরদোর মোছে...। রান্নাবান্না সব এই সুবালাই করে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মিতিন আবার প্রসঙ্গে ফিরল, আপনার ছেলের সঙ্গে ছেলের বউয়ের সম্পর্ক অন্য রকম ঠিক কবে থেকে হয়েছে? অসুখের শুরু থেকেই?

—বলতে পারেন।

—তা সে কতদিন হবে?

—ধরুন, প্রায় তিন সাড়ে তিন বছর।

—চিত্রলেখা তো এ বাড়ি ছেড়েছে মাত্র আট ন'মাস আগে, অ্যাদ্দিন তা হলে সে এখানে পড়ে ছিল কেন?

—আমার স্বামীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল। তাকে অমান্য করে চাকরিতে বেরোত বটে, তবে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার তখন সাহস পায়নি। আচার-আচরণও লেখার তখন অনেক ভদ্র ছিল। আমার স্বামী চলে যাওয়ার পর লেখা লাগামছাড়া হয়ে যায়। দু'মিনিটের জন্যও সমুর ঘরে

ঢুকতে চাইত না। আলাদা শুত, নিজের খেয়ালখুশি নিয়ে থাকত। আমার ছেলেটা যে একা একা গুমরে মরছে...

—আপনি বউকে বোঝাননি?

—দেখুন, মেয়েদের মন বারমুখো হয়ে গেলে সে তখন একটা অন্য জগতে চলে যায়। শাশুড়িকে সে তখন কেয়ার করবে কেন?

—তার মানে আপনার তরফ থেকে আপনি যা বলার বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। নিজের মান বাঁচিয়ে যতটুকু বলা যায়।

—আচ্ছা, চিত্রলেখা যে সেদিন এ-বাড়িতে আসছে, আপনি জানতেন তো?

—অভিকে ফোন করে বলেছিল। মানে আমার ছোট ছেলেকে।...

—কেন আসছে জানতেন?

—অভির মুখে শুনেছিলাম।

—এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর চিত্রলেখা কি ফোন-টোন করত?

—সমুই করত। আমি লাইন ধরে হ্যান্ডসেটটা সমুকে দিতাম।

মিতিন দেখছিল মহিলাকে। এখন আর সৌম্যরূপের মার চোখে জলের আভাস নেই, স্বরও অনেক দৃঢ় শোনাচ্ছে।

অনুচ্চ-স্বরে মিতিন বলল, সেদিন চিত্রলেখা আসার পর তার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?

—না। সারাদিন ধরে ভেবেছিলাম নিজেকে সংযত রাখব, কিন্তু ওকে দেখামাত্র মাথাটা কেমন গরম হয়ে গেল।

—বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

—হ্যাঁ। উলটোদিকের ফ্ল্যাটে গিয়ে বসেছিলাম।

—তখন বাজে ক'টা?

—ঘড়ি তো দেখিনি। তবে হবে আটটা কুড়ি-পঁচিশ।

—আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে তো রাত ন'টায়?

—ডক্টর পাঁজা তো তাই বলছেন।

—তখন আপনি পাশের ফ্ল্যাটেই?

—হ্যাঁ। রানিদির সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথা বলার সময়ে রানিদির ঘড়িতে ঢংঢং করে ন'টা বেজেছিল, আমার মনে আছে।

—আপনি ওখান থেকে ফিরলেন কখন?

—প্রায় সাড়ে ন'টার কাছাকাছি। লেখা তখন চলে গেছে।

—তারপর আপনি ছেলের কাছে গেলেন?

—সমু লেখাকে অসম্ভব ভালবাসত। লেখাকে ছেড়ে থাকতে সমুর খুব কষ্ট হত। সেই লেখা ডিভোর্স পেপার সই করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার বিয়েও করবে শুনছি...। মহিলার গলা সহসা দুলে গেল, আমি কিছুতেই ও ঘরে পা রাখতে পারছিলাম না। তাও মায়ের প্রাণ... দরজায় এসে একবার দাঁড়ালাম। দেখলাম সমু তখন ঘুমোচ্ছে...

—আপনি জানতেন চিত্রলেখা আবার বিয়ে করছে?

—ও মেয়ের হায়া-শরম কিছুই ছিল না। সমুকে নিজেই একদিন ফোনে বলেছিল।

—ও, আচ্ছা। মিতিন ঘরে একবার আলগা চোখ বোলাল। সুদৃশ্য কাঠের শো-কেসের মাথায় এক যুবকের হাস্যমুখ ছবি, মালা পরানো।

ছবিটার দিকে চোখ রেখেই মিতিন বলল, চিত্রলেখা আবার বিয়ে করতে চায় শুনে আপনার ছেলের কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল?

—প্লিজ, ওই প্রশ্নটা আমায় করবেন না। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

—সরি। মিতিন সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করল। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, তা ছেলের ঘরে উঁকি দিয়ে আপনি কোথায় গেলেন?

—নিজের ঘরে। আলো নিবিয়ে শুয়েছিলাম।

—দরজা থেকে আপনার নজরে পড়েনি, স্ক্যাল্প ভেন সেটে সিরিঞ্জটা লাগানো আছে?

—নজর করা উচিত ছিল। খেয়াল করিনি। আর দেখতে পেলেই বা কী হত? সমু তো তখন আর নেই।

—পরে সাড়ে দশটায় ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে দেখলেন...

মহিলা মাথা নাড়ালেন। বড় একটা শ্বাসও ফেললেন যেন।

—ছেলের জন্য কী খাবার ছিল সেদিন?

—চিকেন...না না ভেজিটেবল স্টু। আর টোস্ট। মশলা দেওয়া খাবার সমু আর হজম করতে পারত না।

—শেষ প্রশ্ন। আপনার ছেলে বেডরিডন্ ছিল, নার্স রাখেননি কেন?

—নার্স এসেছে মাঝে মাঝে। সমুর খুব বাড়াবাড়ি হলে...। সমু নার্সের সেবা পছন্দ করত না।

—এমনি সময়ে তাহলে কে করত সব?

—আমি।

—আপনি?

—আমি ছাড়া কে করবে? আর কে ছিল সমুর?

—ও হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। আপনার স্বামীর কি কোনও উইল ছিল?

—উইল করার সে সময় পেল কোথায়। তবে এই ফ্ল্যাট গাড়ি সবই আমার নামে। একটা জমিও আছে আমার নামে, সল্টলেকে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট জয়েন্ট ছিল, এখন আমিই হ্যান্ডেল করি।

—ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন। এটাই লাস্ট। আপনার ছেলের কোনও এল আই সি ছিল?

—ছিল একটা। লাখ দুয়েক টাকার।

—আপনার পুত্রবধূ নিশ্চয়ই নমিনি?

—না। পলিসিটা ও চাকরি পেয়েই করেছিল। বিয়ের আগে। আমার ছোট ছেলে নমিনি। হয়তো বউ-এর নামেই ট্রান্সফার করে দিত, সে সুযোগই বা পেল কই।

মিতিন দু-এক সেকেন্ড চোখ বুজে রইল। তারপর বলল, আপনি এখন যেতে পারেন। ছোট ছেলেকে কাইন্ডলি পাঠিয়ে দিন।

ধীর পায়ে উঠে গেলেন মহিলা। ড্রয়িংহল পেরিয়ে একেবারে কোণে বুঝি তাঁর ঘর, পরদা সরিয়ে ঢুকে গেলেন সেখানে। সে ঘর থেকেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে অভিরূপ।

হেলান দিয়ে বসে দু'হাত সোফার কাঁধে ছড়িয়ে দিল, আপনি তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তাই না?

মিতিন বেশ অবাক, কী করে জানলেন?

—লালবাজারে এক্ষুনি ফোন করেছিলাম...

—ও। আমি জেনুইন কি না কনফার্ম করে নিলেন?

—সে তো করতেই হয়। প্রেস এসে যা জ্বালাচ্ছে। অভিরূপ মুখ বেঁকাল, বলুন কী জানতে চান?

বাহ্ বেশ স্মার্ট তো। মিতিন একটু ঝেঁকে নিতে চাইল ছেলেটাকে। ভুরু কুঁচকে বলল, আপনার তো ঘটনার দিন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে প্রোগ্রাম ছিল, তাই না?

—পুলিশ তো ভেরিফাই করে নিয়েছে।

—ক'টায় প্রোগ্রাম ছিল?

—ন'টা-ফটাতেই ছিল। স্টেজে ওঠার সময় ঘড়ি দেখিনি।

—আপনাদের পপ-টপ তো একটু রাতের দিকেই হয়। দশটা এগারোটার আগে শুরু হয় না। ঠিক বলছি?

—সেদিন হয়েছিল।

—পুলিশ কিন্তু এটা কনফার্ম করেনি।

—মানে? আপনি কী বলতে চাইছেন?

—আমি জানি আপনাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল সাড়ে দশটায়। মিতিন অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল একটা, ন'টা থেকে সাড়ে দশটা আপনি কোথায় ছিলেন?

অভিরূপের মুখ সাদা হয়ে গেল। তোতলাতে শুরু করেছে, —ক্'ককে...কে বলল?

আন্দাজ লেগে গেছে। মিতিন মনে মনে হাসল।

কড়া গলায় বলল, সেটা জানার প্রয়োজন নেই। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

—আ-আ-আমি একজন বন্ধুর সঙ্গে ছিলাম।

—বন্ধু?

—না মানে...বান্ধবী।

—কী নাম?

—পল্লবী। পল্লবী সেন। আমি সাড়ে ন'টা অবধি ওর সঙ্গে ছিলাম, বিশ্বাস করুন। তারপর গিয়ে গ্রুপে জয়েন করি। আপনাকে পল্লবীর ঠিকানা, ফোন নম্বর দিচ্ছি, খবর নিয়ে দেখতে পারেন। আমরা দু'জনে একসঙ্গে গোলপার্কের মোড়ে...

—আপনার বান্ধবীর সাক্ষ্য টেনেবল হবে না। তাকে ইন্টারেস্টেড পার্টি বলে গণ্য করা হবে।

—আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন কেন? অভিরূপের গলা করুণ হয়ে গেছে, আমি কি দাদাকে মারতে পারি?

—কেন নয়? দুনিয়ায় ভ্রাতৃহত্যা অতি কমন ঘটনা।

—কিন্তু কেন মারব? দাদার যে শরীরের হাল হয়েছিল, যা মেন্টাল কন্ডিশান ছিল, দাদা তো যে কোনওদিন হার্টফেল করে মারা যেত।

—আর দাদা মারা গেলে আপনিও দাদার এল. আই. সিটা পেয়ে যান। মোরওভার পৈতৃক সম্পত্তিরও আর কোনও ভাগীদার থাকে না।

—এ কী বলছেন? আমি এসব কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।

—হয়তো তাই। কিন্তু আপনাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে, নয় কি?

—বিশ্বাস করুন, আমি না। আমি কারুর কোনও সাতে পাঁচে থাকি না। দাদার কথা ভাবলে আমার কান্না পায়।

—আর বউদির কথা ভাবলে? মিতিনের গলা হিমশীতল, তিনি অ্যারেস্ট হওয়ায় আপনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন?

—কেন? খুশি হব কেন?

—প্রথমত, আপনি ঝুটঝামেলা থেকে বাঁচলেন। মানে পুলিশের টানাহেঁচড়া থেকে। সেকেন্ডলি টাকাপয়সার আর একটা সম্ভাব্য দাবিদার কমে গেল। থার্ডলি, তিনি আপনার দাদাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। তিনি বিপাকে পড়ায় আপনার আনন্দ পাওয়ারই কথা।

অভিরূপ ঠোঁট টিপে রইল একটুক্ষণ। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, সেদিকে তাকাল একবার। তারপর চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথা বলব? বউদি দাদাকে মেরেছে, এটা এখনও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

—কেন? তিনি তো অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন? আপনার দাদাকে এই অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন?

—এ সময়ে বলা উচিত নয়, তাও বলছি। আমার দাদাও বউদির ওপর কম মেন্টাল টর্চার করেনি। সারাক্ষণ খিটখিট, মেজাজ, অশ্রাব্য গালাগালি...বউদির মতো ডিগনিফায়েড মেয়ে কেন সহ্য করবে বলুন? কতদিন বরদাস্ত করবে? মাত্র ছ'মাস ঘর করেছে বলে সারাজীবন রোগী ঘাঁটতে হবে? একটা খিটখিটে পঙ্গু স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে? অবশ্য দাদার দিক দিয়ে দাদাও ঠিক। একটা টগবগে ইয়াং ছেলে হঠাৎ যদি পারমানেন্টলি ইনভ্যালিড হয়ে যায়, তার তো কিছু সাইকোলজিকাল প্রবলেম হতেই পারে। আমি অমন অবস্থায় পড়লে হয়তো আমারও হত।

অনিশ্চয় মজুমদার যতটা অপোগণ্ড বলেছিলেন, তত যেন অপোগণ্ড নয়। ঘটে বেশ যুক্তি-বুদ্ধি আছে তো ছোকরার।

মিতিন টেরচা চোখে তাকাল, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আপনার বউদি খুনী নন?

—এ কথা তো বলিনি। হয়তো বউদিই...। সেদিন সেই মোমেন্টে কী ঘটেছিল, কেমন করে বলব? হয়তো দাদা এমন কিছু করেছিল, বউদি

উত্তেজনার মাথায়...। অভিরূপ ঢোক গিলল, আমি বলছিলাম, বউদিকে অপরাধী ভাবতে আমার ভাল লাগছে না।

—আপনার বউদির ওপর বেশ উইকনেস আছে মনে হচ্ছে?

—না। আমি নিউট্রাল। আমি যা দেখেছি বুঝেছি, তাই বলছি।

—আপনি জানেন, আপনার বউদি আবার বিয়ের কথা ভাবছিলেন?

—আমি সবই জানি। দোষও দেখি না কিছু। আফটার অল তারও তো একটা লাইফ আছে। কেন একটা ইনভ্যালিড লোকের জন্য সে পচে মরবে? প্রত্যেকেরই নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার আছে। বউদি যখন সেদিন ফোন করে ডিভোর্সের কথা বলল, আমি বলেছিলাম তোমার এ ডিসিশান আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল।

নাহ্ ছেলেটার ওপর বেশ শ্রদ্ধাই জাগছে। মিতিন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আপনার মার সঙ্গে বউদির সম্পর্ক কেমন ছিল?

—মা একটু রিজার্ভড প্রকৃতির। তবে একেবারে দাদাঅন্ত প্রাণ। দাদা কষ্ট পেলে...। অবশ্য মা কোনওদিনই বউদিকে মুখে কিছু বলেনি। অ্যাটলিস্ট আমি যত দূর জানি।

—হুম, পুরো এপিসোডটাই বড় স্যাড। মিতিন উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা, আপনার মা বলছিলেন দাদা মারা যাওয়ার সময়ে তিনি রানিদির ফ্ল্যাটে ছিলেন। কোন ফ্ল্যাটটা রানিদির?

—ঠিক উলটো দরজাটাই।...আপনি কি এখন ওখানেও যাবেন নাকি?

—এই মিনিট পাঁচ সাত। অল্প দু'চারটে কথা আছে আর কী।

—কার সঙ্গে কথা বলবেন? সে তো এক ঢকঢকে বুড়ি। মা যে কী করে ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করে। চোখে দেখে না কিছু, আপন মনে বিড় বিড় করে যায়...

মিতিন থমকাল সামান্য, ও বাড়িতে আর কে আছেন?

—আছে বুড়িরই স্যাঙাৎ এক আধকালা ঝি। অন্নদামাসি। হাঁটতে হাঁটতে দরজা পর্যন্ত এলো অভিরূপ, বুড়ি খুব বড় বাড়ির বউ ছিল। সিংহগড়ের জমিদার বাড়ির একমাত্র ছেলের বউ। এই যে আমাদের কম্পাউন্ডটা, গোটাটা ওদের জমি ছিল। বুড়ির ছেলেরাও ঘ্যাম ঘ্যাম। কেউ স্টেটসে, কেউ কানাডায়...। বড় বড় নাতি-নাতনি আছে।

মিতিন বিনা মন্তব্যে শুনছিল। দরজায় এসে বলল, আপনার মাকে বলবেন, চললাম। তবে দরকার হলে আবার এসে জ্বালাব কিন্তু।

অভিরূপ ঘাড় নাড়ল। হাসল সামান্য, মুখে কিছু বলল না।

তিন

রানি লাহিড়ীর ফ্ল্যাটে ঢুকে মিতিন ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। এ তো এক মিনি রাজপুরী! দেওয়ালে ইয়া বড় বড় অয়েল পেন্টিং, মোষের মাথা, বাঘের চামড়া, সিলিং-এ পেল্লাই ঝাড়লণ্ঠন। আস্ত বাঘ আছে একখানা, পিতলের। তবে সবেতেই বেশ ধুলোর আস্তরণ।

অন্নদা মিতিনকে রানি লাহিড়ীর ঘরে নিয়ে এল। প্রায় মানুষ সমান উঁচু আবলুস কাঠের পালঙ্কে আধশোয়া হয়ে আছেন বৃদ্ধা রানি। কুঞ্চিত চামড়া, শনের দড়ির মতো চুল, টকটকে রং বাদামি মেরে গেছে। চোখের মণি সব্‌জেটে। অস্বচ্ছ কাঁচের গোলক যেন।

অন্নদা চেঁচিয়ে বলল, মা পুলিশের লোক এয়েচে।

রানি খরখর করে উঠলেন—কী ব্যাপার বলো তো বাছা? সেদিনও এসে একগাদা জেরা করে গেলে, আজ আবার এয়েচ?

মিতিন বলল, আজ জেরা নয়। আপনার সঙ্গে আজ গল্প করতে এসেছি।

—ওমা, এ যে মেয়ে পুলিশ। কালে কালে কত কী হল, পিঠে পুলির ন্যাজ গজাল। মেয়েছেলেও প্যায়দা হয়েছে। তা বাছা, সমু মরল বলে তোমরা বারবার আমার কাচে আসচ কেন?

—বারে, সমুর মা আপনার বন্ধু না?

—অপর্ণার কতা বলচ? আহা বড় দুঃখী মেয়ে। ছেলেটাকে নিয়ে ক'টা বছর বেচারার কী আতান্তরই না গেল।

—আপনার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করতেন বুঝি?

—একজায়গায় তো মানুষকে হালকা হতে হয়। আমার ছেলেরা থেকেও নেই, অপর্ণার ছেলেটা বেঁচে মরে ছিল। দু'জনে দু'জনকে মনের কথা বলে দুঃখু জুড়োতুম। বিধাতার কী লীলা। সেই ছেলেকেও বউ মেরে দিয়ে গেল। ঠিক হয়েচে মাগী ধরা পড়েচে। ভগবান মাতার ওপর আচে না...।

মেল ট্রেনের মতো কথা বলে চলেছেন রানি। হঠাৎ দেওয়ালঘড়িতে বাজনা বেজে উঠল। বিচিত্র এক সুর, বিদেশি। থামতেই ঢং ঢং ঢং ... বারোটা বাজছে। কবজি ঘুরিয়ে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিল মিতিন।

বৃদ্ধাকে থামানোর জন্যই বলল, আপনার ঘড়ির আওয়াজটা তো জব্বর?

—আমার ছোট ছেলে পাটিয়েচে। কানাডা থেকে। আওয়াজটা বড্ডো জোর, শুনলে বুক কেঁপে যায়। রানি মাড়ি বিছিয়ে হাসলেন, তবে মজাও আছে। ঘর অন্ধকার করে দিলে এ ঘড়ি আর বাজবে না।

মিতিন অনুসন্ধিসু চোখে তাকাল। ওপরে নীচে দুটো কালো কালো টিপ রয়েছে ঘড়িটার। ফটো সেল্? আজকাল অবশ্য এ ঘড়ির কলকাতাতেও ছড়াছড়ি। ঘণ্টা যখন বাজছে, আলো নিবিয়ে দাও, ওমনি আওয়াজ বনধ্।

বৃদ্ধা আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছেন, আমি তো এই ঘণ্টার ভয়ে আলোই জ্বালি না। দিনের বেলাটুকু কান বুজে কাটিয়ে দিই, ব্যস সন্ধে হলেই নিশ্চিন্দি। আলো না জ্বললে আমার কী বলো? অন্ধের কী বা দিন, কী বা রাত্রি।

—বটেই তো। মিতিন ঘাড় দোলাতে গিয়েও থেমে গেল। বলল, অপর্ণা দেবী যে বললেন, আপনার ঘড়িতে সেদিন ন'টা বাজল...।

—বেজেছিল তো। অপর্ণা বলল, ন'টা বেজে গেছে, এবার দেকি আস্তে আস্তে ঘরে যাই...বউটা হয়তো এতক্ষণে বিদেয় নিয়েচে...

—উনি কি ঘণ্টা বাজার পরেই চলে গেলেন?

—না। তার পরেও তো ছিল কিছুক্ষণ।

—ঘণ্টা বাজার ঠিক আগেই কি এসেছিলেন?

—দাঁড়াও একটু ভেবে নিই। বৃদ্ধার গোটা মুখ কুঁচকে গেল। পরক্ষণেই উদ্ভাসিত, মনে পড়েচে। ঘণ্টা বাজার অনেক আগেই এয়েচিল। কান্নাকাটি করচিল খুব। আমি কত মাতায় হাত বোলালুম...। একটু শান্ত হয়ে, সুস্থির হয়ে অন্নদাকে পান কিনতে পাটালো। পান আনার পরই তো ঘরে চলে গেল।

—ও! আচ্ছা মাসিমা, উনি কি এসে বউয়ের নামে খুব নিন্দে করতেন?

—নিন্দে ও কারওরই করত না বাছা। দুষত নিজের কপালকে।

—আপনার সঙ্গে বউটার আলাপ ছিল?

—ছিল একটু-আদটু। বড় বিদ্যের দেমাক ছিল মাগীর, আমার সঙ্গে বেঁকা সুরে কথা বলত। যা, এখন জেলের লপ্সি খা!

কিছু না বলতেই অন্নদা এক কাপ চা নিয়ে এসেছে। চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল মিতিন। অন্নদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। এবার লিফ্‌ট ধরেই নামল, সিঁড়ি বেয়ে নয়। একা মনে ভাবতে ভাবতে কখন যেন গেটের বাইরে। চওড়া ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। ওপরে শ্রাবণের

মলিন আকাশ, নীচে এক বিষণ্ণ দিন। দিনটা যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছিল মিতিনের বুকের ভেতর। একটা ছবি ফুটে উঠছে আবছা, মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎই মস্তিষ্কের কোষে বিদ্যুতের ঝলসানি। মিতিন দাঁড়িয়ে পড়ল। এক সেকেন্ড চোখ পিটপিট করে ভাবল কী যেন, তারপরই উলটো মুখে দৌড়েছে। সোজা আকাশলীনা। হাঁপাতে হাঁপাতে সিকিউরিটি কাম দারোয়ানের ঘরে ঢুকল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সিকিউরিটির ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মিতিন। মুখ তার বর্ষার আকাশের মতো থমথমে।

চার

অভিরূপ দরজা খুলে চমকে গেল, আপনি আবার?

মিতিন ভারী গলায় বলল, বলেছিলাম তো, দরকার হলে আবার আসতে পারি।

—বলুন কী দরকার?

—আপনার মাকেও ডাকুন। এক সঙ্গেই দু'জনকে বলব।

আওয়াজ পেয়েই বুঝি অপর্ণা বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। বিস্মিত চোখে দেখছেন মিতিনকে।

দু'জনের দৃষ্টি উপেক্ষা করে মিতিন সোজা সোফায় গিয়ে বসল। কেটে কেটে বলল, চিত্রলেখা ফাঁসিকাঠে ঝুললে আপনার কি ভাল লাগবে অপর্ণা দেবী?

অপর্ণা নিরাসক্ত চোখে তাকালেন, অনেক পাপের ফল তো ভুগতেই হবে।

—তার থেকেও বড় পাপ কিন্তু আপনি করেছেন। আপনিই সৌম্যরূপকে মেরে ফেলেছেন।

—কী পাগলের মতো কথা বলছেন? অভিরূপ চেঁচিয়ে উঠল, কী বলছেন আপনি জানেন?

—ঠিকই বলছি। অপর্ণা দেবী সজ্ঞানে, সুপরিকল্পিতভাবে, ঠান্ডা মাথায় আপনার দাদাকে হত্যা করেছেন। মিতিন সরাসরি অপর্ণার চোখে চোখ রাখল, অঙ্কটা কেঁদেছিলেন খুব ভাল, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি।

অপর্ণা নতমস্তকে দাঁড়িয়ে। অভিরূপ একবার মাকে দেখছে, একবার মিতিনকে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—বুঝবেন। বলি। দৃশ্যগুলো আমি পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি, ভুল হলে অপর্ণা দেবী সংশোধন করে দেবেন। চিত্রলেখা সেদিন ঘরে ঢোকা মাত্র অপর্ণা দেবী বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। আবার ফিরে এলেন। স্বামী স্ত্রীতে কথা হচ্ছে, পর্দার এপার থেকে নিঃসাড়ে শুনছেন। বুকের মধ্যে কান্না জমে উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও। চিত্রলেখার ঘুমের ইঞ্জেকশান দেওয়া দেখলেন অপর্ণা দেবী। সত্যিই ছোট সিরিঞ্জ খুঁজে না পেয়ে রাইলস টিউবের জন্য রাখা পঞ্চাশ সিসির সিরিঞ্জটা দিয়েই সৌম্যরূপকে ঘুম পাড়িয়ে দিল চিত্রলেখা। ব্যথায় ছটফট করছিল সৌম্যরূপ। শুধু ব্যাধির যন্ত্রণায় নয়, মনের ব্যথাতেও। দেখে সহ্য হচ্ছিল না অপর্ণা দেবীর, চিত্রলেখা বেরোনর মুখে মুখে তিনি সরে গেলেন নিজের ঘরে। ওঁর ঘরটা একটেরে। সৌম্যরূপের ঘর থেকে বেরোনর সময়ে দেখাই যায় না প্রায়। চিত্রলেখা চলে যাওয়ার পরই ছেলের ঘরে এলেন অপর্ণা, হাতে তখন তার গ্লাভস্। অথবা রুমাল। পুত্রবধূর দয়া দেখিয়ে স্বামীকে ঘুম পাড়ানো, তখন তার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। উনি নিজে ডাক্তারের স্ত্রী, এয়ার এম্‌বলিজম কী করে করতে হয় ওঁর জানা আছে। বুকে পাথর চেপে ঘুমন্ত ছেলের হাতে বাতাস ইনজেক্ট করলেন অপর্ণা দেবী। বুদ্ধিও অপর্ণা দেবীর অতি ক্ষুরধার, দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে ছুটলেন সামনের ফ্ল্যাটে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন রানি লাহিড়ী, তাঁর ঘরের আলো জ্বাললেন, তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করলেন। মনের মধ্যে তখন তাঁর তোলপাড় চলেছে, কথা বেরোচ্ছে না। শুধুই কান্না আসছে...। কাঁদতে কাঁদতেও হিসেব ভোলেননি। ঠিক দশটা বাজার মিনিট কয়েক আগে অন্নদাকে পান কিনতে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক দশটা বাজার পর ঘণ্টা বাজা শুরু হল। এক দুই তিন চার...। কথা বলতে বলতে এক পা এক পা করে সুইচবোর্ডের দিকে সরে যাচ্ছেন অপর্ণা দেবী, নবম ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো অফ্। দশম ঘণ্টা আর বাজল না। অন্ধ রানি লাহিড়ী কিছুই টের পেলেন না, কিন্তু তাকে ন'টার ঘণ্টা বাজার কথাটা অপর্ণা দেবী স্মরণ করিয়ে রাখলেন। এবং অন্নদা ফেরার পর তিনি নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন। তখনই প্রায় সাড়ে দশটা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকলেন, তারপর পুলিশ...। যেভাবে যা চেয়েছিলেন অপর্ণা দেবী, সবই পর পর ঘটতে লাগল। একে তিনি মা, তার ওপর ন'টার অ্যালিবাই তাঁর করাই আছে, তাই তিনি আগাগোড়াই সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে গেলেন। কিন্তু একটা কথা

মাথায় আসেনি। অন্নদাকে কায়দা করে তিনি হঠিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে যে চিত্রলেখা যাওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছে, এ তথ্য সিকিউরিটির কাছ থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়। অতএব ন'টার সময়ে চিত্রলেখাও চলে যাচ্ছে, আবার ন'টার সময়ে অন্নদাও বেরোচ্ছে—দুটো কিছুতেই মেলানো যাবে না। তা ছাড়া যিনি ছেলের জন্য এত কনসার্নড, তিনি ছেলেকে ভেজিটেবিল স্টু দিচ্ছিলেন, না চিকেন স্টু তাও ঠিক ঠিক মাথায় রাখতে পারেননি। কারণ, তিনি তো ছেলেকে সেদিন খাবারই দেননি। তার আগেই...। মিতিন একটু থামল। একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে গেছে, দম নিল খানিক। তারপর বলল, চিত্রলেখার ওপর আপনার এত আক্রোশ অপর্ণা দেবী? নিরীহ মেয়েটাকে এভাবে ফাঁসাতে চাইছিলেন?

সহসা অপর্ণার চোখ মুখ বদলে গেছে। বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠলেন, যা করেছি, বেশ করেছি। আমার ছেলের ভালর জন্য করেছি। দগ্ধে দগ্ধে মরার হাত থেকে ওকে মুক্তি দিয়েছি আমি। যে ওকে এত কষ্ট দিয়েছে, তাকেই বা আমি ছাড়ব কেন?

চিৎকার ক্রমশ কান্নায় বদলে যাচ্ছে। বুকফাটা কান্নায় ডুকরে ডুকরে উঠছেন অপর্ণা। গোটা ফ্ল্যাট মথিত হচ্ছে হাহাকারে।

মিতিনের বুকটাও মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। আহা রে, একজন মা কত যন্ত্রণা পেলে তবেই না এভাবে সন্তানকে...! পুত্রস্নেহ এত তীব্র হয়!

মিতিন এখন কী করবে? নিঃশব্দে চলে যাবে এখান থেকে?

না, তা হয় না। চিত্রলেখাকেও তো বাঁচাতে হবে।

কাঁপা কাঁপা পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল মিতিন।